শিক্ষা ও সভ্যতা

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

১. শিক্ষার লক্ষ্য

২. অন্নচিন্তা

৩. রোম

৪. আর্যামি

৫. বৈশ্য

৬. সবুজের হিন্দুয়ানি

৭. ধর্ম-শাস্ত্র

৮. চাষি

৯. ভারতবর্ষ

১০. তুতান্-খামেন্

১১. গণেশ

শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষা সম্বন্ধে এমন কতকগুলি তত্ত্বকথা প্রচলিত আছে, যাদের উদ্দেশ্য–কিছুই না বলিয়া, সমগ্র বিষয়টার একটা সর্বজনসম্মত সুগভীর মীমাংসা করা। এই সকল তত্ত্ববাক্যের মধ্যে একটি এই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য যথার্থ মানুষ তৈরি করা। মানব-শিশু যখন সচরাচর মানুষের শরীর ও মন লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়, এবং যেটি না-হয়, শিক্ষার দ্বারা তাহাকে যথার্থ মানুষ করার চেষ্টা স্বয়ং বৃহস্পতির পক্ষেও নিস্ফল, তখন যথার্থ মানুষ কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্বজ্ঞেরা অবশ্য উত্তরে বলিবেন— আদর্শ-মানবকে, অর্থাৎ অসাধারণ মনুষ্যকে। আদর্শ-মানব যে কী প্রকার জীব, সে সম্বন্ধে কাহারও সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনও রূপ ধারণা না থাকাতে, জিনিসটা যে অতিশয় কাম্য এবং শিক্ষার দ্বারা অবশ্যালভা, এ বিষয়ে কাহারও কোনও দ্বিধা উপস্থিত হয় না; এবং একটা দুরূহ প্রশ্নের সহজ সমাধানে মনও প্রসন্ন হইয়া ওঠে। ইহার পরেও যদি কেহ জানিতে চায় আদর্শ-মনুষ্য কাহাকে বলে, তবে অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবেন। তবে কোনও কোনও তত্ত্বজ্ঞ হয়তো অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন যে, আদশ-মনুষ্য সেই, যাহার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল শক্তি বা বৃত্তিই সম্যক অনুশীলিত হইয়াছে ও পূর্ণরূপে স্মূর্তিলাভ করিয়াছে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য এই শ্রেণির মানুষ গড়িয়া তোলা। এখন কথা এই যে, প্রথমত এহেন মানুষ চর্মচক্ষে দূরের কথা, কেহ কখনও মানস-নেত্রেও দেখেন নাই। পৃথিবীর কবি ও কল্পনাকুশল লোকেরা যে-সকল মহাপুরুষ ও অতিমানুষের আদর্শ-চিত্র

আঁকিয়াছেন, সে সকলের কোনওটিই একাধারে সর্বশক্তিচোম্পন্ন অসম্ভব মানুষের চিত্র নয়। সেগুলির কোনওটিতে দেখিতে পাই বহু-শক্তির একত্র সমাবেশ, কোনওটিতে বা দু-একটি বৃত্তির অতিমাত্রায় বিকাশ; কিন্তু তাহার প্রতিটিই রক্তমাংসের মানুষেরই চিত্র। দ্বিতীয় কথা এই যে, সকল শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি দূরে থাক–দুই-চারিটি শক্তির একসঙ্গে একটু অসাধারণরকম স্ফূর্তির পরিচয় যাহার শরীরে আছে, এমন লোক হাজারে একজন মেলা কঠিন; অথচ শিক্ষা যে সকলের জন্যই প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। তপস্বী বাল্মীকি যখন নারদকে বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, বিদ্বান প্রভৃতি অশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন ত্রিলোকজ্ঞ নারদ সেই ত্রেতাযুগেও ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভব রামচন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও নাম করিতে পারেন নাই। এবং কোনও বিশেষ শিক্ষাপ্রণালীর ফলে রামচন্দ্র যে এই সকল গুণের আধার হইয়াছিলেন, এমন কথা নাবাদও বাল্মীকিকে বলেন নাই, বাল্মীকিও আমাদিগকে বলিয়া যান নাই। তৃতীয় কথা, যদি প্রকৃতই আদর্শ-মানব বা অতিমানুষ গড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য হইত এবং এই উদ্দেশ্য সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ শিক্ষার ফলে পৃথিবীটা মানুষের পক্ষে বাসের উপযুক্ত থাকিত কি না, সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যে সমাজ-বন্ধনের ভিত্তির উপর মানুষের সভ্যতার ইমারত গঠিত হইয়াছে, তাহার মূল এই যে, মানুষে মানুষে শক্তির প্রভেদ আছে, এবং সে প্রভেদ কোনও শিক্ষার সাহায্যে সম্পূর্ণ লোপ করা যায় না। এই পার্থক্য ও তারতম্য আছে বলিয়াই সমাজে শ্রমবিভাগ ও কার্যবিভাগ সম্ভবপর হইয়াছে, এবং এই বিভিন্নতার উপর মানুষের সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হইতে অদ্যাবধি সমস্ত পরিণতি নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। যদি শিক্ষার ফলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া সকলকেই সর্বশক্তিসম্পন্ন আদর্শ-মানুষে পরিণত করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে সমাজের সমস্ত কাজের কল-কারখানা তখনই বন্ধ হইয়া যাইত।

মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে বলিয়াই মানুষের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। যদি শিক্ষার ফলে সকলেই আদর্শ-মানুষ, অর্থাৎ এক ছাঁচের মানুষ হইয়া উঠিত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের সঙ্গ আমাদের নিকট এমনই অসহ্য বোধ হইত যে, মানুষ ঘর ছাড়িয়া বনে পালাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিত না। শেষ কথা, পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এক-একজন অতিমানুষের জন্ম হয়। তাহার ফলে কর্মের জগতে বা চিন্তার রাজ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা স্মরণ রাখিলে সমাজ যদি কেবল অতিমানুষেরই সমাজ হইত। তাহা হইলে ব্যাপারটা কী ঘটিত মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া ওঠে।

অতএব তত্ত্ববেত্তারা যাহাই বলুন না কেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ-মানুষ গড়াও নয়, অতিমানুষ তৈরিও নয়। কেননা এই উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হইবার সুদূর সম্ভাবনাও নাই, এবং যদি কোনও সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে তাহার ফল অতি ভয়ংকর হইয়া উঠিত।

২

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞলোকদের আর একটি মত এই যে, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত–ছাত্রের চরিত্রগঠন। চরিত্র জিনিসটা কী, তাহা লইয়া তর্ক না-ই তুলিলাম। ধরিয়া লওয়া যাক চরিত্র সেই সকল গুণের সমঞ্জসীকৃত সমষ্টি, যাহা মানুষের থাকা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। এই সকল গুণের তালিকা এবং সমষ্টির বিষয়, তাহদের রূপ ও মাত্রা সম্বন্ধে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা যে ছিল এবং আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও ভিন্ন দেশকালের প্রচলিত মত কিছু এক নয়। এই বিজ্ঞ বচনের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, মুখে যিনি যাহাই বলুন না কেন, কি প্রাচীন কি

আধুনিক কোনও শিক্ষাপ্রণালীই প্রকৃত কাজের বেলায় ছাত্রের চরিত্রগঠনকে তাহার প্রধান লক্ষ্যস্বরূপে গ্রাহ্য করে নাই। যিনি শিক্ষার দ্বারা চরিত্রগঠন বিষয়ে অতিমাত্র উদ্যোগী, তিনিও সাহিত্যের একশো পাতার মধ্যে দশ পাতা হিতোপদেশ থাকিলে ভাল হয়, এই কথাই বলেন, এবং ইস্কুলের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আধঘণ্টার জন্যেই নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহার কারণ এ নয় যে, মানুষের চরিত্র জিনিসটা সমাজের পক্ষে কিছু কম প্রয়োজনীয়; ইহার কারণ এই যে, চরিত্র জিনিসটা সেরূপ শিক্ষণীয় নয়। মানুষের চরিত্র প্রধানত নির্ভর করে বংশানুক্রম এবং পরিবার ও সমাজের বিশেষ অবস্থার উপর। কেবলমাত্র শিক্ষকের শিক্ষার দ্বারা চরিত্রে যে পরিবর্তন করা যায়, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য; এবং তাহাও আবার শিক্ষার গৌণ ফল। সোজাসুজি নীতিশিক্ষার দ্বারা চরিত্র গড়িবার চেষ্টা করিলে, সে শিক্ষা অতি নীরস হইয়া ওঠে–এবং তাহার ফলও প্রায়ই বিপরীত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন কালে গ্রিস দেশের পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং প্লেটো তাহার যে-সকল মত সক্রেটিসের নামে চালাইয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা মত এই যে, চরিত্র বা virtues জ্যামিতি ও অলংকার-শাস্ত্রের ন্যায়ই একটা শিক্ষণীয় বস্তু। কিন্তু এই মতের মূলে আছে তাহার। আর একটি মত। প্লেটোর মতে ভালমন্দের জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে লাভ করা যায়, এবং সেই জ্ঞান লাভ করিলেই মানুষ সচ্চরিত্র হয়। এই জ্ঞানবাদের–intellectualism-এর বিরুদ্ধে ইউরোপের অনেক মনীষী আজ লেখনী ধরিয়াছেন; এবং বেদাধ্যয়নেও যে দুরাত্মার চরিত্রের কোনও পরিবর্তন হয় না, তাহা আমাদের দেশের উদ্ভট কবিতার অজ্ঞাতি-নামা কবি অনেক পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন।

এ বিষয়ে একটা ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সহিত বিলাতের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিয়া আমাদের কর্তৃপক্ষেরা এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধব সর্বদাই বলিয়া থাকেন, এবং

আমরাও শুনিয়া শুনিয়া বলি যে, বিলাতে ইস্কুল-কলেজে ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয়, আর আমাদের ইস্কুল-কলেজ হইতে ছাত্রেরা কেবল কতকগুলি কথা মুখস্থ করিয়া চলিয়া আসে। কথাটা সত্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাক। কিন্তু ইহাতে এ প্রমাণ হয় না যে, বিলাতের ইস্কুল ও ইউনিভার্সিটিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ফলেই ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয়। বরং আমাদের কর্তৃপক্ষেরা উলটো কথাই বলেন। তাহারা বলেন যে, সেখানকার ইস্কুল-ইউনিভার্সিটির life বা আবহাওয়াতেই শিক্ষার্থীদের চরিত্র গড়িয়া ওঠে। অর্থাৎ সেখানকার ছাত্রদের চরিত্র সেখানকার বিদ্যালয়গুলির সামাজিক জীবনের ফল, শিক্ষার ফল নয। সুতরাং সামাজিক অবস্থার গুণে যেটা আপনা হইতেই জন্মলাভ করে, সেটাকে শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইয়া আমাদের ছাত্রগণের কোনও হিতৈষী যেন তাহাদের পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে শেলির পরিবর্তে Smiles-এর আমদানি না করেন।

৩

এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি আদর্শ-মানুষ গড়াও না হয়, শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন করাও না হয়তবে তাহার উদ্দেশ্যটা কী? এ প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নয়, এবং সে উত্তরও সকলেরই জানা আছে; কিন্তু সেটা প্রকাশ করিয়া বলিতে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর লজ্জিত হই। কেননা উত্তরটা অতি সাধারণ রকমের, এবং বড় কথা বলিয়া ও শুনিয়া আমরা যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি।—সোজা কথা বলায় ও শোনায় আমরা সে-সুখে বঞ্চিত হই।

কথাটা এই যে–শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া; অর্থাৎ যার প্রথম সোপানকে সমস্ত বিষয়টার নামস্বরূপে ব্যবহার করিয়া আমরা বাংলা কথায়

বলি-লেখাপড়া শিখানো। কি পুরাতন, কি বর্তমান সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্যই যে এই বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া, তাহ টোল, পাঠশালা, ইস্কুল, কলেজগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। নিতান্ত সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এই স্থূল বিষয়টা আর কাহারও চোখ এড়াইবার সম্ভাবনা নাই! শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে-সকল তত্ত্বকথা আছে, তাহদের উদ্দেশ্যই এই নিতান্ত সোজা কথাটাকে চাপা দেওয়া, যাহাতে তাহা নিজগুণে প্রকাশ না হইয়া পড়ে।

তত্ত্বজ্ঞানীদের সমস্ত বচন উপেক্ষা করিয়া এবং বিজ্ঞব্যক্তিদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, পৃথিবীর শিক্ষালয়গুলি যগন বরাবর বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াকেই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছে, তখন ইহার মূলে যে নিছক বোকামি ছাড়া আরও কিছু আছে, তাহাতে অতি-বুদ্ধিমান ভিন্ন আর কেহ সন্দেহ করিবেন না। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, বিদ্যাশিক্ষাই যে কার্যত শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া আছে, কেবল তাঁহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে উহাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে, বিদ্যাশিক্ষা জিনিসটা মানবসমাজের যুগযুগান্তরসঞ্চিত সভ্যতার সহিত পৃথিবীতে নবাগত মানবসন্তানের পরিচয় করানো। এই পরিচয় শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব, এবং শিক্ষা ভিন্ন আর কোনওরকমেই হইবার উপায় নাই। আদিম কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু-আয়াসলব্ধ সভ্যতার ফল নানা বিদ্যারূপে সঞ্চিত আছে ও হইতেছে। শিক্ষা এই বিদ্যাগুলির সঙ্গে মানুষের পরিচয় সাধন করে। অতি সভ্যসমাজের শিশুও অসভ্য হইয়া জন্মায়, এবং শিক্ষার মধ্য দিয়া এই বিদ্যাগুলির সহিত পরিচয় লাভ না করিলে অসভ্য অবস্থাতেই বাড়িয়া উঠিত। অসভ্য অর্থ বুদ্ধিহীনও নয়, হৃদয়হীনও নয়, অসভ্য অর্থ বিদ্যাহীন। অসভোর সমাজ সেই সমাজ, যাহার প্রতিপুরুষের লোকের জন্য পূর্বপুরুষের ও পূর্বকালের এমন কোনওই সঞ্চিত বিদ্যা নাই, যাহা বিশেষ শিক্ষা ভিন্ন আয়ত্ত হয় না। সভ্যসমাজের লোক ইস্কুল-কলেজে শিক্ষা না পাইলেও

বংশানুক্রমের ফলে এবং সামাজিক অবস্থার প্রভাবে মোটামুটি সভ্য সমাজোচিত বুদ্ধি ও চরিত্র লাভ করে; কিন্তু রীতিমতো শিক্ষা না পাইলে অতি বড় পণ্ডিতবংশের প্রতিভাবান সন্তানও মুর্খই থাকিয়া যায়। কেননা বিদ্যার বংশানুক্রম নাই। সকলরকম বিদ্যাই প্রতি যুগের লোককে নূতন করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। এবং এই ক্রমাগত নুতন চেষ্টার ফলেই মনুষ্যসমাজের লব্ধ বিদ্যা প্রালব্ধ না হইয়াও রক্ষিত হয়। যদি পৃথিবীর একপুরুষের সমস্ত লোক একবার সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা হইতে বিরত থাকে, তবে মানুষের আদিকাল হইতে একাল পর্যন্ত সঞ্চিত সমস্ত বিদ্যা ও সভ্যতা একপুরুষেই লোপ পায়, এবং মানুষকে আবার প্রাচীন বর্বরতায় কঁচিয়া বসিয়া সভ্যতার পুনর্গঠন আরম্ভ করিতে হয়। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা ব্যাপারটা একেবারে অকিঞ্চিৎকর জিনিস নয়। ইহার অর্ধ-মানুষের বহুযুগের চেষ্টার ফলে অর্জিত সভ্যতার সহিত পরিচিত হইয়া, অসভ্য অন্তত ন-সভ্য অবস্থা হইতে সভ্য হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কষ্টলব্ধ প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করা।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিতে হইলে একবারে অনেকটা গোড়ার কথা ধরা ছাড়া উপায় নাই।

৪

মানুষের সভ্যতা অতি প্রাচীন। সচরাচর কথাবার্তায় আমরা এই প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে ধারণা প্রকাশ করি, ইহা তদপেক্ষা অনেক বেশি প্রাচীন। প্রাচীন সভ্যতার কথা উঠিলেই আমরা বৈদিক, ব্যাবিলন, বা মিশরের সভ্যতার কথা তুলিয়া এমনভাবে কথা কই, যেন ওইগুলি মানবসভ্যতার আদিম অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে ওই সকল সভ্যতা অতি সুপরিণত এবং মানুষের সভ্যতার প্রথম অবস্থা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অনেক বিষয়ে ওই সকল সভ্যতা যেস্থানে

আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহার পর হইতে একাল পর্যন্ত মানুষের সভ্যতা সেদিকে আর বড় বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই। এই কথা মনে না থাকায় আমরা যাহাকে আধুনিকতা বলি, প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য হই, এবং এই সকল সভ্যতা হইতেও বহু প্রাচীন অথচ পরিপুষ্ট সভ্যতার বিবরণ আবিষ্কার হইলে আমরা অতিমাত্রায় বিস্ময় প্রকাশ করি।

মানুষের এই সুপ্রাচীন সুপরিণত সভ্যতা মানুষ যে সম্পূর্ণ অসভ্যতার হাত হইতে ক্রমশ উদ্ধার করিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই, এবং বর্তমানের অতি সুসভ্য মানুষ যে অতীতের নিতান্ত অসভ্য আদিম মানুষেরই বংশধর তাহাতেও সন্দেহ করিবাব কোনও কারণ দেখি না। মানুষ যে অসভ্যতা হইতে ক্রমশ সুসভ্যতায় উপনীত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বর্তমান যুগের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে বড় একটা সংশয় নাই। তাহারা জানিয়া রাখিয়াছেন যে, ইহা ইভলিউশনের ফল। ইহার অর্থ কেবলমাত্র এই নয় যে, মানুষের সভ্যতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে; কেননা এই ক্রমবিকাশের কথা তো অল্প-বিস্তর ঘটনারই বিবৃতি, তাহার ব্যাখ্যা নয়। এই ইভলিউশন্যবাদের সম্পূর্ণ অর্থটা এই যে, যে নিয়মে অতি নিম্নশ্রেণির জীবদেহ হইতে পৃথিবীতে অতি উচ্চশ্রেণির জীবশরীর এমশ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া প্রাণতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ঠিক সেই নিয়মেই মানুষের সভ্যতা অতি নীচ অবস্থা হইতে ক্রমশ উচ্চ অবস্থায় আসিযা পৌঁছিয়াছে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক হার্বাট স্পেন্সার এই মতটা খুব জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন এবং সেই প্রচারের কাজটা এতই সাফল্য লাভ করিয়াছে যে, যাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্পেন্সারের লেখার সহিত কোনও পরিচয় নাই, তাহাদেরও এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এবং বোধ হয় এই মতটা পোষণ করা আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিকবুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াই শিক্ষিত-সমাজে গণ্য ও মান্য। কিন্তু মতটা আগাগোড়া মিথ্যা। পৃথিবীতে জীবশরীরের ক্রমবিকাশের নিয়মের সহিত মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির কোনও সম্পর্ক নাই। এই দুই ব্যাপারের নিয়ম

ও প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক, এবং পৃথক বলিয়াই অসভ্য শিশুকে শিক্ষা দিয়া সুসভ্য মানুষ করা সম্ভব হয়, এবং পৃথক বলিয়াই সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা এতটা স্থান জুড়িয়া আছে। যদি, সত্যই Organc Evolution-এর নিয়মে মানবসভ্যতার বিকাশ হইত। তাহা হইলে মানুষের জীবনে শিক্ষার কোনও স্থান থাকিত না; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতালব্ধ সমস্ত বিদ্যা শিশুর মনে আপনিই স্ফুরিত হইত এবং যে হতভাগ্যের হইত না স্বয়ং ফ্রোবেলও সারাজীবন শিক্ষা দিয়া তাহাকে বর্ণ পরিচয় করাইতে পারিতেন না।

Organic Evolution-এর মূলে আছে Heredity অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন, উদর সর্বস্ব জীবাণু হইতে যে পৃথিবীতে ক্রমে মানুষের জন্ম হইয়াছে ইহার গোড়ার কথা এই যে, জনক জননীর দেহের ও মনের ধর্ম সন্তানে সংক্রমিত হয়। ফলে যখন জনক জননীর শরীরে বা মনে নুতন কিছুর আবির্ভাব হয় তখন তাহাদের সন্তান, অন্বয়ানুসারে সেই নূতনত্ব লাভ করে। যদি জীবন-সংগ্রামে এই নূতন কিছুর দ্বারা কোনও সুবিধা হয় তবে যাহাদের সেটা আছে তাহার সাহায্যে সেই শ্রেণির প্রাণীর মধ্যে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে এবং বংশ রাখিয়া যায়, বাকিগুলি নির্বংশ হইয়া মরে। এবং এইরূপে যুগের পর যুগ নানা বিভিন্ন অবস্থায় নূতনত্বের উপর নূতনত্ব পুঞ্জীভূত হইয়া সর্বেন্দ্রিয়হীন এক Cell-এর জীব হইতে পশুপক্ষী ও মানুষের উদ্ভব হইয়াছে। এই হইল Organic Evolution সম্বন্ধে পণ্ডিতদের আধুনিক মত।

কেমন করিয়া জীবশরীরে এই নূতনত্বের আবির্ভাব হয় এবং কোন জাতীয় নূতনত্ব Organic Evolution-এর প্রধান ভিত্তি, এ সম্বন্ধে ত্রিশ বছর পূর্বে পণ্ডিতেরা যতটা একমত ও নিঃসংশয় ছিলেন এখন আর তেমন নহেন। তখনও ডারউইনের প্রচারিত ব্যাখ্যাই সকলে মান্য করিতেন। ওই ব্যাখ্যা অনুসারে জনক জননীর সহিত সন্তানের যে-সব ছোটখাটো জন্মগত বিভিন্নতা প্রতিদিনই দেখা যায়, যাহার ফলে ছেলেটা বাপের মতো হইয়াও

ঠিক তাহার মতো হয় না, সেই নিত্যসিদ্ধ নূতনত্বই ইভলিউশনের প্রধান সহায়। আর এক সহায, প্রত্যেক প্রাণীর জীবনকালের মধ্যে বাহিরের চাপে ও ভিতরের চেষ্টায় তাহার মধ্যে যে পরিবর্তন উপস্থিত হয়। কিন্তু ডারউইনের এই মতের আসন এখন টলিয়াছে। এখন পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যে নূতনত্বের উপর ভর করিয়া unicellular জীব মানুষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা প্রতিদিনকার আটপৌরে নূতনত্ব নয়। প্রাণীর শরীরে মাঝে মাঝে অতি দুর্জ্ঞেয় কারণে হঠাৎ এক-একটা বড় রকমের পরিবর্তন উপস্থিত হয়। যদি তাহাতে জীবনযুদ্ধের কোনও সহায়তা হয় তবে তো কথাই নাই, অন্ততপক্ষে যদি নিতান্ত বিপত্তিকর না হয় তাহা হইলেই ওই পরিবর্তনটি স্থায়ী হইয়া বংশানুক্রমে চলিতে থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরই মত যে এই সকল হঠাৎ-উপস্থিত বড় রকমের নূতনত্বই Organic Evolution-এর প্রধান কারণ। প্রতি প্রাণীর জীবদ্দশায় বাহিরের প্রকৃতির 5৮° ৩3 ভিতরের শক্তির প্রয়োগে তাহার মধ্যে যে পরিবর্তন হয়। সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখন বলিতেছেন যে, ওই-জাতীয় পরিবর্তন সন্তান-সন্ততিতে মোটেই সংক্রমিত হয় না। প্রাণীর শরীরে দুই রকমের মালমশলা আছে। এক শ্রেণির মালমশলায় তাহার শরীর গঠিত হয়, দ্বিতীয় রকমের মালমশলা বংশরক্ষার জন্য সঞ্চিত থাকে। বাহিরের চাপে বা ভিতরের চেষ্টায় যে পরিবর্তন তাহা ওই প্রথম শ্রেণির মালমশলাতেই আবদ্ধ থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণির মালমশলা সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিয়া যায়। ফলে ওই স্বোপার্জিত পরিবর্তন সন্তান-সন্ততির নিকট পৌছে না। যখন দ্বিতীয় শ্রেণির মালমশলায় পরিবর্তন উপস্থিত হয়, সেই পরিবর্তনই বংশানুক্রমে চলে। এই পরিবর্তনের কারণ এখন পর্যন্তও একেবারেই অজ্ঞাত। এবং জীবশরীরে যে-সকল হঠাৎ বড় বড় পরিবর্তন উপস্থিত হইয়া Organic Evolution-G ধাপে ধাপে টানিয়া তুলিয়াছে তাহার কারণ এই দ্বিতীয় রকমের মালমশলায় পরিবর্তন।

এই তো গেল। সংক্ষেপে Organic Evolution-এর নিয়ম-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বর্তমান মত। এখন ইহার সহিত মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির সম্পর্কটা কী? মানুষের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সংগীত কিছুই তো মানুষের শরীরে দাগ কাটে না, বিশেষত শরীরের সেই মালমশলাগুলিতে যাহার উপর বংশানুক্রম নির্ভর করে। এগুলি বাহিরের বস্তু। মানুষ এগুলিকে আবিষ্কার করিয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা এক পুরুষের শরীর হইতে আর এক পুরুষের শরীরে সঞ্চারিত হয় না। এক পুরুষের মানুষ পরের পুরুষের মানুষকে এগুলি সঞ্চিত ধনের মতো দান করিয়া যায়। ইহারা মানুষের heredity নয়, inheritance। এগুলির বংশানুক্রম নাই, আছে উত্তরাধিকার। এবং এ ধানের উত্তরাধিকারী একমাত্র অঙ্গজ নয়, সমগ্র মানবসমাজ।

তারপর ডারউইনের Survival of the fittest নিয়মেরও এখানে কোনও প্রভাব নাই। সভ্যতার যাহা শ্রেষ্ঠ ফল তাহার দ্বারা জীবনসংগ্রামে কোনও কাজই হয় না। Binomial theorem আবিষ্কার করিয়া Newton-এর জীবনযাত্রার এবং বংশরক্ষার যে কোন সুবিধা হইয়াছিল, ইহা তাহার জীবনচরিত লেখকেরা বলেন না, এবং যাহারা ওই তত্ত্বটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই তাঁহারা যে নির্বংশ হন নাই। ইহাও নিশ্চিত। কাব্য রচনার ফলে 'জীবনযুদ্ধে জয়লাভের কতটা সুবিধা হয় সে সম্বন্ধে দেশি বিদেশি ভুক্তিভোগী কবিদের আত্মোক্তির অভাব নাই, এবং অকবি লোকও যে সংসারে টিকিয়া থাকে এবং বংশরক্ষা করিয়া। তবে মরে তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

এ কথা সত্য যে, মন ও ইন্দ্রিয়ের যে-সব শক্তির প্রয়োগে মানুষ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, ওই শক্তিগুলি Organic Evolution-এরই ফল। মানুষের বুদ্ধি, প্রতিভা, কল্পনা, ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মানুভূতি এগুলি যে জন্মগত

ইহা তো প্রতিদিন চোখেই দেখা যায়। এবং ওই শক্তিগুলিই যে জীবনযুদ্ধে মানুষের সহায় হইয়া তাহাকে পৃথিবীর রাজাসনে বসাইয়াছে তাহাও স্থিরনিশ্চিত। কিন্তু ওই শক্তিগুলিকে যে-সব কাজে লাগাইয়া মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা Organic Evolution-এর চোখে একবারে বাজে খরচ, সম্পূর্ণ অপব্যবহার। Organic Evolution-এর ফলে মানুষ লাভ করিল তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি, যেন শিকারের ও শিকারির মৃদু পদশব্দটিও কানে না এড়ায়, মানুষ সেই সুযোগে গড়িল সংগীতবিদ্যা। ইভলিউশনে মানুষ পাইল দশ আঙুলের সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতি, যেন তাহার তিরের লক্ষ্যটা একেবারে অব্যর্থ হয়; সে বসিয়া গেল তাত পাতিয়া মলমল বুনিতে, আর তুলি ধরিয়া ছবি আঁকিতে। ইভলিউশন মানুষকে দিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর কল্পনা যেন সেনানা ফিকিরে শরীরটাকে ভাল রকম বাঁচাইয়া বংশটা রাখিয়া যাইতে পারে, মানুষ গড়িয়া তুলিল কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন। ইভলিউশনে মানুষের কণ্ঠে আসিল ভাষা— যাহাতে তাহার পক্ষে দলবদ্ধ হওয়া সহজ হয়, মানুষ সৃষ্টি করিয়া বসিল— ব্যাকরণ আর অলংকার। মোট কথা মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে প্রাণেব ঘরের চোরাই মাল মনের কাজে খরচ করিয়া। প্রাণের ঘরকন্নার জিনিস মনের বিলাসে ব্যয় করার নাম সভ্যতা।

মানুষের এই তহবিল তছরুপের একটা ফল এই যে, মানুষের ইন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি Organic Evolution-এ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়ছিল সেইখানেই থামিয়া আছে। ঐতিহাসিক কালের মধ্যে যে এই সকল শক্তির কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। প্রাচীন গ্রিক অপেক্ষা যে নবীন ফরাসির বুদ্ধি ও রূপজ্ঞান অধিক তাহার কোনও প্রমাণ নাই, এবং বৈদিক যুগের হিন্দুর অপেক্ষা আমাদের মানসিক শক্তি যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এমন কথা কি সবুজপন্থী কি সনাতনপন্থী কেহই বলিবেন না। তবে প্রাচীন কালের তুলনায় বর্তমান সভ্যতার অনেক বিষয়ে আশ্চর্যজনক বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতের যাহা স্বপ্নেরও অতীত ছিল বর্তমানের শিশুরাও

তাহা হাতেখড়ির পরেই শেখে। তাহার কারণ সভ্যতা বাড়ে টাকার সুদের মতো। এক যুগের মানুষ যাহা সৃষ্টি করে, পরের যুগের মানুষ শিক্ষার সাহায্যে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া আবার তাহার উপর নূতন সৃষ্টির আমদানি করে, এইরকমে প্রাচীন সৃষ্টির উপর নবীন সৃষ্টি জমা হইয়া মানুষের সভ্যতা বাড়িয়া চলে। প্রাচীন যুগে যাহারা সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন তীহাদের মানসিক শক্তি যে আমাদের চেয়ে কিছু কম ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টার ফল যে অনেক বিষয়ে আমাদের কাছে খুব সামান্য বোধ হয় তাহার কারণ আমরা পাইয়াছি তাহার পরের শত যুগের চেষ্টার পুঞ্জীভূত ফল। এবং আমরা যে নূতন সৃষ্টি করি তাহা এই বহুযুগের সৃষ্টিকে ভিত্তি করিয়া। এই জমানো সভ্যতার পুঁজি যে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর খোয়া যায় না। তাহা নয়; তখন আবার মানুষকে কঁচিয়া আরম্ভ করিতে হয়। এবং বুনিয়াদি ঘরের জমানে টাকার মতোই ইচ্ছা করিলে কিছুমাত্র না বাড়াইয়া দুই-এক পুরুষেই ইহাকে ফুকিয়া নিঃশেষ করিয়াও দেওয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের বেশি দূরে যাইতে হইবে না।

৫

Organic Evolution-এর রাজ্যে বিদ্রোহী হইয়া তাহার রাজ্য লুটিয়া আনিয়া, মানুষ যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফল সঞ্চিত হইয়াছে সাহিত্যে, কলায় এবং বিবিধ বিদ্যায়। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এইগুলির সহিত মানুষের পরিচয় করাইয়া দেওয়া। এই সকল বিদ্যা ও কলা অতীতের নিকট হইতে বর্তমানের উত্তরাধিকার। শিক্ষার লক্ষ্য এই উত্তরাধিকারে মানুষকে অধিকারী করা। কেননা এ তো কোম্পানির কাগজের দান নয় যে ঘরে

বসিয়া সুদ পাওয়া যাইবে। এ হইল কষ্টে গড়া ব্যবসায়ের উত্তরাধিকার। কাজ শিখিয়া চলাইতে পারিলে তবেই লাভের সম্ভাবনা।

সভ্যতার এই ফলগুলি শিক্ষার দ্বারা মানুষকে আয়ত্ত করানো যায়, কেননা যে শক্তির প্রয়োগে ইহাদের সৃষ্টি সে শক্তি অল্প-বিস্তর মানুষ জন্ম হইতেই লাভ করে। সেই জন্য অসভ্য সমাজের শিশুও শিক্ষা পাইলে সভ্যসমাজের ছেলের মতোই সভ্যতার বিদ্যাগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারে। ইহার পরীক্ষা অনেকবার হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে সভ্যসমাজের ছেলেকেও শিক্ষা পাইয়াই এই বিদ্যাগুলির সহিত পরিচিত হইতে হয়। কেননা বিদ্যা তো মানসিক শক্তি নয়, উহা মানসিক শক্তির সৃষ্টি এবং সহস্র যুগের মানব-প্রতিভার সমবেত সৃষ্টি। প্রকৃতি যাহার কপালে প্রতিভার তিলক পরাইয়াছেন, যে কেবল সভ্যতার সৃষ্টিগুলিকে নিজস্ব করিতে পারে তাহা নয়, তাহার উপর নিজের সৃষ্টিও যোগ করিতে পারে, তাহাকেও এই শিক্ষার দ্বারা দিয়াই সভ্যতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। কেননা এমন প্রতিভার কল্পনা করা যায় না, যাহা সভ্যতার কোনও সৃষ্টিকে আবার প্রথম হইতে একাই গড়িয়া তুলিতে পারে। প্রাচীন সৃষ্টির উপর দাড়াইয়াই তবে নূতন সৃষ্টি করা সম্ভব।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্তমান যুগে আর একটি মত প্রচলিত হইয়াছে যাহা বিজ্ঞলোকের পাণ্ডিত্যের ফল নয়। সংসারের চাকা বর্তমান যুগের মানুষ ও জাতির হৃদয় পিষিয়া এই মতটা নিংড়াইয়া বাহির করিয়াছে। মতটি হইল। এই যে, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য মানুষকে জীবন-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য–মানুষকে এমনভাবে গড়িয়া তোলা, যেন সে টিকিয়া থাকিয়া বংশরক্ষা করিয়া যাইতে পারে! এই মতটির আবির্ভাব মানবসভ্যতার একটা tragedy। ইহা মনের উপর প্রাণের প্রতিশোধ। প্রাণের ঘরে ডাকাতি করিয়া মানুষ মনের ভোগের জন্য সভ্যতা গড়িয়াছে। কিন্তু ইহার দু'-একটি সৃষ্টিকে আবাবা প্রাণের কাজে লাগাইতে গিয়া জীবনযাত্রাটা এমনই জটিল ও কঠিন

হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ প্রাণ রাখিতে যা কেবল প্রাণান্ত হইতেছে তাহা নয়, একেবারে মনান্ত হইতেছে। মনের যা কিছু শক্তি ও ক্ষমতা এক প্রাণ রাখার কাজেই ব্যয় করিতে হইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া কোনও লাভ নাই। যাহা জীবন হইতে ঠেলিয়া উঠিতেছে কেবল মত দিয়া তাহাকে চাপা দেওয়া চলে না। এ হইল ভিড়ের ভিতর ঠেলাব মতো; ব্যাপারটা কেহ পছন্দ কবে না, কিন্তু পিছু হটবারও কাহারও সাধ্য নাই।

বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে হয়তো এই জটিলতার হাত এড়ানো অসাধ্য। এবং হয়তো বাধ হইয়াই বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীকে জীবন-যুদ্ধেব জন্য তৈরি করাটাই শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রাণের দাবির সুর যখন খুব চড়া হইয়া ওঠে তখন আর সব ফেলিয়া সেই দিকেই কান দেওয়া ছাড়া গতি নাই। কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়াও না মনে করি যে এই বিসদৃশ ব্যাপারটাই হইল সভ্যতার উন্নতি। এ ভুলের আশঙ্কা আছে। কেননা মন আব ইন্দ্রিয়ের যে শক্তির প্রযোগে মানুষ সভ্যতা গড়িয়াছে, আজ জীবনযাত্রার জটিলতায় সেই সব শক্তির উপরেই প্রাণ তাহার একাধিপত্যের দাবি পেশ করিয়াছে। ফলে মানুষের বুদ্ধি, কল্পনা, প্রতিভা ব্যয় হইতেছে অনেক, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য কেবল প্রাণ বাঁচানো ও জাত বাঁচানো। ইহা সভ্যতা নয়, এ হইল সভ্যতা যে পথে চলে তাহার একবারে বিপরীত পথ। প্রাণের কাজে যাদের প্রথম প্রকাশ, মনের ভোগে তাদের শেষ পবিণতি হইল সভ্যতা। প্রাণের ব্যাগারে সমস্ত মনটাকেই নিঃশেষ করিয়া দেওয়া অসভ্যতা না হইতে পারে। কিন্তু সভ্যতা না।

ফাল্গুন ১৩২৩

অন্নচিন্তা

আমাদের বৈশেষিকেরা বলেছেন অভাব একটি পদার্থ। এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকলে কি আর তাদের চোখে পরমাণু ধরা পড়ে! আজি এই ঘোরতর অন্নাভাবের দিনে, অভাব যে একটা অতি কঠিন পদার্থ তাতে কে সন্দেহ করে? অথচ এই তত্বটি প্রাচীন আচার্যেরা জেনেছিলেন যোগবলে। কেননা সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে যে অন্নাভাব ছিল না। সে বিষয়ে একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা একমত, আর বিলাতি সভ্যতাই যে দেশের সমস্ত রকম অভাবের মূল, অর্থাৎ ওই সভ্যতার আমদানির পূর্বে যে দেশে কোনও কিছুরই অভাব ছিল না, এ তো আমাদের সকলেরই জানা কথা। সুতরাং কি ঘরে কি বাইরে, কোনও স্থানেই বৈশেষিক আচার্যের অভাবকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কাজেই সে সম্বন্ধে আঁরা যে তত্বটি প্রচার করেছেন সেটি পুরাণের ভবিষ্যৎরাজবংশাবলির মতো, আর সুশ্রুতের শারীর-স্থান-বিদ্যার মতো সম্পূর্ণ ধ্যানলব্ধ সামগ্রী।

কুতার্কিক লোকে হয়তো এইখানে তর্ক তুলবেন যে, বৈশেষিকেরা যে অভাবকে পদার্থ বলেছেন সে অভাবের অর্থ কেবল negation। আর পদার্থ মানে বস্তু নয়, বিলাতি দর্শনে যাকে বলে category তাই। এবং এই তত্বটির অর্থ মাত্র এই যে অভাব বা negation মনন-ব্যাপারের অর্থাৎ thought-এর একটা necessary ক্যাটিগরি। কিন্তু এই তর্ক আর কিছুই নয়, এ হল হিন্দু-দর্শনের পবিত্র মন্দিরেও ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ ঘটিয়ে তার জাত মারবার চেষ্টা। নিশ্চয় জানি, কোনও খাঁটি হিন্দু এ-সব তর্কে কান দেবেন না। সুতরাং এ তর্কের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষে অন্নাভাব ছিল না তার একটি অতি নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। মাধবাচার্য তার সর্বদর্শন-সংগ্রহে ছোট-বড় সমস্ত রকম দর্শনের বিবরণ দিয়েছেন। একটি পাণিনিদর্শনের বর্ণনা আছে, যাতে প্রমাণ

করা হয়েছে যে ব্যাকরণশাস্ত্রই পরম পুরুষার্থের সাধন, ওই শাস্ত্রে পারদর্শী না হলে সংসার-সাগর পারের আশা দুরাশা এবং ওই শাস্ত্রই মোক্ষমার্গের অতি সরল রাজপথ। এমনকী একটি রসেশ্বর-দর্শন আছে, যাতে যুক্তি এবং শ্রুতি উভয় প্রমাণেই প্রতিপাদিত হয়েছে যে রস বা পারদই পরব্রহ্ম। রসার্ণব, রাসহাদয় প্রভৃতি প্রামাণিক দার্শনিক গ্রন্থ থেকে যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে; এবং রসজ্ঞেরা শুনে খুশি হবেন, যে শ্রুতি-প্রমাণটি আহত হয়েছে সেটি তাদের সুপরিচিত 'রসো বৈ সঃ রসো হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি' এই শ্রুতিবাক্য। এমন পুথিতেও অন্নদর্শন বলে কোনও দর্শনের বিবরণ দূরে থাক নাম পর্যন্ত নেই। এ থেকে কেবল এই অনুমানই সম্ভব যে, প্রাচীনকালে এদেশে আন্নাভাব না থাকায় অন্নচিন্তাও ছিল না, এবং বিষয়টা সম্বন্ধে একবারে চিন্তার অভাবেই এ বিষয়ে কোনও দর্শনের উদ্ভব হয়নি। কেননা ও-বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা থাকলে যে তার একটা দর্শনও থাকত, তাতে বোধ হয় যে প্রমাণ দেখিয়েছি তারপর আব্ব কোনও বুদ্ধিমান লোকে সন্দেহ করবেন না। এবং আমার এই যুক্তিটি যে সম্পূর্ণরূপে 'বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক প্রণালী সম্মত তাও নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকের উষ্চাসন একবার গ্রহণ করেছি তখন কোনও সত্যই গোপন করলে চলবে না। অপ্রীতিকর হলেও সমস্ত কথাই প্রকাশ করে বলতে হবে! অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে যে দেশে আন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না। এ বিষয়ে সর্বদর্শন-সংগ্রহের প্রমাণ অকাট্য। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে খুব প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগে কিছু কিছু অন্নাভাব ছিল। কেননা শ্রুতিতে অন্ন সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। এর বিস্তৃত প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ধরুন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগু-বরুণের উপাখ্যান। বরুণের পুত্র ভৃগু যখন পিতার কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করলেন তখন বরুণ

তাকে বলেন তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়, তুমি তপস্যা করো। তবে সুবিধার জন্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে একটা 'ফরমুলা' বলে দিলেন, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি। তপস্যা করে ভৃগু জানলেন অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই সকলের জন্ম হয়, জন্মের পর অন্নের বলেই সকলে বেঁচে থাকে, অন্নের দিকেই সকলের গতি এবং শেষে অন্নেই সবাই লীন হয়, অতএব অন্নই ব্রহ্ম। ভৃগু এই জ্ঞানটুকু লাভ করে পিতার কাছে গেলে বরুণ তাকে আবার তপস্যা করতে বললেন। দ্বিতীয়বার তপস্যায়। ভৃগুর বোধ হল প্রাণই ব্রহ্ম। এইরকমে তৃতীয়বারে জানলেন মনই ব্রহ্ম। চতুর্থবারে বুঝলেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। অবশেষে শেষবার তপস্যায় এই জ্ঞানে পৌছিলেন যে আনন্দই ব্রহ্ম। এই হল ভৃগু-বরুণের গল্প, যাকে বলে 'ভার্গবী বারুণী বিদ্যা'। এই শ্রুতি সম্বন্ধে শঙ্কর ও অন্যান্য ভাষ্যকারেরা নানা তর্ক তুলেছেন, 'পঞ্চকোষ বিবেক' ও ওইরকম সব দুর্বোধ্য জটিলতার অবতারণা করেছেন। কিন্তু এর প্রকৃত অথচ সহজ ইঙ্গিতটি কেউ ধরতে পারেননি। এই উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য কি এই নয় যে গোড়ায় অন্ন থাকলে তবেই শেষ পর্যন্ত আনন্দ পাওয়া যায়! ইহাই যে শ্রুতির প্রকৃত মর্ম ও শিক্ষা তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই এবং একটু বিচার করে দেখলে বোধ হয় পাঠকেরও কোনও সন্দেহ থাকবে না। কেননা উপাখ্যানটি শেষ করেই শ্রুতি চারটি পরিচ্ছেদে কেবল অন্নেরই প্রশংসা করেছেন। এবং তার মধ্যে এমন সব শ্রুতি আছে যাতে যে-কোনও ইকনমিস্টের' প্রাণ আহ্লাদে নৃত্য করে উঠবে। প্রকৃত ব্যাপারটা এই যে উপাখ্যানটি পড়লেই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোতে ওর প্রকৃত অর্থটা স্পষ্ট ধরা পড়ে; এবং শঙ্কর প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকেরা কেন যে ওর যথার্থ মর্ম বুঝতে পারেননি তার কারণও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্বেই প্রমাণ করেছি যে ওই সব দার্শনিকদের সময়ে কোনও অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না। এবং তাদের যে-কোনও historical sense বা 'ঐতিহাসিক অনুভূতি' ছিল না তা যার ওই sense বিন্দুমাত্র আছে তিনিই জানেন। সেইজন্য বৈদিক সময় যে তাঁহাদের সময়ের চেয়ে কিছুমাত্র অন্যরকম ছিল এটা তাঁরা কল্পনাই

করতে পারতেন না। ফলে বর্তমান কালে আমরা যে higher criticism বা ‘উচ্চতর অঙ্গের সমালোচনা’র বলে প্রাচীনকালের মনের কথাটা একেবারে ঠিকঠাক বুঝে নিতে পারি, শঙ্কর প্রভৃতির সে সামর্থ্য ছিল না। অবশ্য ওই সমালোচনা-প্রণালীর নামের higher বিশেষণটা যাঁরা ও-প্রণালীটা প্রবর্তন করেছেন তাঁরাই দিয়েছেন, কিন্তু সত্যের খাতিরে বিনয়কে উপেক্ষা করবার মতো সৎ সাহস তাদের সকলেরই ছিল।

যাহোক পূর্ববর্তী আলোচনার ফলে এটা বেশ জানা গেল যে বৈদিক সময়ের পরে আর অন্নচিন্তায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা বড় মাথা ঘামাননি। তাঁরা ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন এবং কামসূত্রেরও অনাদর করেননি, কিন্তু মাঝখান থেকে অন্নসূত্রটা একেবারে বাদ দিয়েছেন। এর ফলভোগ করছি আমরা, তাদের এ যুগের বংশধরেরা। আমাদের অন্নের অভাব অত্যন্ত বেশি, এবং কীসে ও বস্তুটার কিছু সংস্থান হয় তার একটা মোটামুটিরকম মীমাংসারও বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু বহুযুগের বংশানুক্রমিক অনভ্যাসের ফলে ও-সম্বন্ধে চিন্তা বা আলোচনা করতে গেলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন আমরা কে যে কী বলি তার কিছু ঠিক থাকে না। সেইজন্য আমাদেব বাংলাদেশে দেখা যায়, যিনি আইনের বিদ্যা ও বক্তৃতা বেচে টাকা জমিয়েছেন, তিনি সভায় দাঁড়িয়ে বাঙালির ছেলেকে ইস্কুল-কলেজে বৃথা সময় নষ্ট না করে চটপট ব্যাবসা-বাণিজ্যে লেগে যেতে খুব জোরালো বক্তৃতা দেন। অবশ্য সেই ব্যাবসাবাণিজ্যের মূলধনের জন্য তাঁর জমানো টাকার কোনও অংশ পাওয়া যাবে না, কেননা তাঁর যে বংশধর ওকালতি করবে। কিন্তু উপার্জন করবে না তার জন্য সেটা সঞ্চিত থাকা নিতান্ত দরকার। এবং বলা বাহুল্য, যে ‘শিল্প-বাণিজ্যে না ঢুকে’ ‘লেখাপড়া শিখে চাকুরি খুঁজে বেড়ায় বলে’ বাংলার যুবকেরা লেখায় ও বক্তৃতায় হিতৈষীদের গঞ্জনা শুনছে, সেই শিল্প ও বাণিজ্য দেশের কোথায় যে তাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে সেটা তাদের

দেখানো কেউ প্রয়োজন মনে করিনে। ভাবটা এই যে না-ই বা থাকল বাঙালির ছেলের মূলধন, না-ই বা থাকিল দেশে তাদের জন্য কোনও শিল্প-বাণিজ্য, তাঁরা কেন প্রত্যেকেই বিনা মূলধনে আরম্ভ করে নিজের চেষ্টায় এক একটা শিল্পের বড় বড় কারখানা গড়ে তোলে না, বড় রকম ব্যাবসার মালিক হয়ে বসে না। কেননা কোনও কোনও দেশে কোনও কোনও লোক যে কদাচিৎ ওইরকম ব্যাপার করেছে, তা তো পুথিতেই লেখা আছে। তারপর আমাদের এই অন্নসমস্যার সমাধানের জন্য ইস্কুল-কলেজ সব তুলে দিয়ে সে জায়গায় কৃষিপরীক্ষাশালা ও শিল্প-বিদ্যালয় খোলাই যে একমাত্র উপায় সে বিষয়ে কেউ যুক্তি-তর্ক দেখান; আর যাঁরা কাজের লোক তাঁরা যে-হয় কোনও ছেলেকে, যা-হোক কিছু একটা শিখে আসবার জন্য, যে একটা হোক বিদেশে যাওয়ার জাহাজ-ভাড়া সাহায্যের জন্য চান্দার খাতায় স্বাক্ষর করাতে আরম্ভ করেন। আর এ যুগের বাঙালির ছেলেও হয়েছে এক অদ্ভুত জীব। বর্তমানে ধনে-জনে যে জাতি পৃথিবীর মাথাব্য বসে আছেন শোনা যায়, বুকের মধ্যে র্তাদের হৃৎপিণ্ডে পৌছিতে হলে তাদের গায়ের জামার অংশবিশেষের ভিতর দিয়েই তার সোজা, এবং মন্দ লোকে বলে একমাত্র পথ। বাঙালির ছেলের অবস্থাটা ঠিক উলটো। নিজের পকেট সম্বন্ধেও খুব বেশি সজাগ ও উৎসাহান্বিত করতে হলে, এদের একেবারে বুকের মধ্যে ঘা না দিলে কোনওই ফল পাওয়া যায় না। দেশি শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া যে দেশের ধনবৃদ্ধির ও ধনরক্ষার জন্য একটা ‘টারিফের’ প্রাচীর মাত্র, ‘পলিটিক্যাল ইকনমি’ নামক বিজ্ঞানশাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক এবং মহাজনের খাতার হিসাব-নিকাশেরই বিষয়, তা এরা কিছুতেই বুঝতে চায় না, এবং বুঝলেও তাতে কোনও ফল হয় না। এরা চায় গান আর কবিতা, যার বিষয় হচ্ছে দেশের উত্তরের হিমালয়ের মাথার বরফের মুকুট, দক্ষিণের নীল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, এবং যখন সমস্ত পৃথিবী মুক ছিল তখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সামগানে সিন্ধু সরস্বতীর তাঁর ধবনিত করেছিলেন, সেই কাহিনি। অথচ এরা যে

হাতেকলমে কাজে লাগতে পারে না বা কাজ উদ্ধার করতে পারে না, এমন নয়। এরা অর্ধোদয়-যোগে দেশের দীনতমকেও নারায়ণের পূজায় সেবা করে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গেই করে; বন্যার জলে চালের বস্তা পিঠে নিয়ে সাঁতার দেয়, এবং কোনও ডিপার্টমেন্টের বিনা চালনায় অনুষ্ঠানটি যেমন করে নির্বাহ করে, তাতে কাজের চেয়ে কাজের শৃঙ্খলাই যাদের গর্বের প্রধান বিষয়, সেই ‘ডিপার্টমেন্টের’ কর্তাদেরও কতক বিস্ময় কতক সন্দেহের উদ্রেক হয়; জাতির একটা দুর্নােম ঘোচাবার জন্য এরা তুর্কির গুলিতে টাইগ্রিসের তীরে প্রাণ দিতে রাজি হয়, এবং তার শিক্ষানবিশিতে পুব-পশ্চিমের কোনও জাতির চেয়ে কম পটুতা দেখায় না। কিন্তু এ তো অতি স্পষ্ট যে এ সকলই কেবল ভাবের খেলা, এর মধ্যে বস্তুতন্ত্রতা কিছুই নেই। প্রকৃত কাজের বেলায় এদের চরিত্রে কোনও গুণই দেখা যায় না। এরা কিছুতেই উপলব্ধি করে না যে খুব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও একনিষ্ঠার সঙ্গে আরম্ভ করে, সংসারযুদ্ধে জয়ী হয়ে দশের এক হওয়াই সবচেয়ে বড় কাজ, চরিত্রের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। সেইজন্য যদিও বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার পুথিতে এদের সেই সব মহাপুরুষদের জীবনী পড়ানো হয় যাঁরা খুব হীন অবস্থা থেকে পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতি বহু সদগুণের সদ্ব্যবহারে নিজেদের অবস্থা খুব বেশিরকম ভাল করেছিলেন; এবং ইংরেজি হাতের লেখা লিখতে আরম্ভ করেই সময় আর টাকা যে একই জিনিস কপিবুক’ থেকেই এরা সে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করে, তবুও কিছু বড় হলেই এই পুস্তকস্থা-বিদ্যার ফল এদের স্বভাবে কিছু দেখা যায় না। তখন বাল্যশিক্ষার পুথির মহাজনদের অনুরূপ যে সব কৃতকর্মী পুরুষ, সমাজে সশরীরেই বর্তমান এরা তাদের কোনও খবরই বাখে না, এমনকী তাঁরা দেশের রাজার কাছে খুব উঁচু সম্মান পেলেও নয়। যাঁরা কেবল কথার সঙ্গে কথা গাঁথতে পারে, বা লজ্জাবতীর পাতায় তামার তার জড়ায়, এরা তাদের নিয়েই অসঙ্গতারকম হইচই করে। অন্নচিন্তায় যে এরা কাতর নয়, কি অন্নচেষ্টা যে এদের উত্তেজিত করে না তা নয়। সে চিন্তায় এরা যথেষ্টই ক্লিষ্ট; সে চেষ্টায় এরা অনেক দুঃখ,

অনেক অপমানই সহ্য করে। কিন্তু সে-সব সত্ত্বেও ওই চিন্তা আর ওই চেষ্টাকেই পরমোৎসাহে সমস্ত মন দিয়ে বরণ করে নিতে কিছুতেই এদের মন সরে না। এদের ভাব কতকটা এইরকম যে রোগ যখন হয় তখন ডাক্তারও ডাকতে হয়, ঔষধও গিলতে হয় এবং হাঙ্গামও কিছু কম হয় না। এবং যে চিররোগী, সমস্ত জীবনই বাধ্য হযে তাকে এই হাঙ্গাম সইতে হয়। কিন্তু তাই বলে রোগের চিকিৎসাকেই সবচেয়ে বড় উৎসাহের ব্যাপার করে তোলা সম্ভবপর নয়।

আমরা বাংলাদেশের ছেলে বুড়ো অন্নচিন্তার ব্যাপারে সবাই যে এই সব আশ্চর্য ও অস্বাভাবিক কাণ্ড করি, পূর্বেই বলেছি। এতে আমাদের দোষ কিছু নেই। দোষ পূর্বপুরুষদের যাবা ও-সম্বন্ধে সুচিন্তা ও মনের কোনও স্বাভাবিক ঝোক রক্ত-মাংসের সঙ্গে আমাদের দিয়ে যেতে পারেননি। এই দায়িত্বহীনতার সাহসেই এই প্রবন্ধও শুরু করেছি। কেননা জানি, বেফাঁস কথা যা কিছু বলব তাতে আমার নিজের দায়িত্ব কিছুই নেই। দায়ী সেই পিতৃপুরুষেরা যাঁরা পিণ্ডের আশা করেন। কিন্তু পিণ্ডের অন্ন সম্বন্ধে একনিষ্ঠ হয়ে চিন্তা করবার মতন মনের বা মগজের অবস্থা নিজেদের না থাকায় আমাদেরও দিয়ে যেতে পারেননি।

২

দেশের প্রাচীন আচার্যেরা যখন অন্ন সম্বন্ধে চিন্তাই করেননি, তখন সে চিন্তায় কিছু সাহায্য পেতে হলে পশ্চিমের আধুনিক যবনাচার্যদের কাছেই যেতে হয়। এঁদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা অন্ন-জিজ্ঞাসারই একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে তুলেছেন। কিন্তু অন্ন সম্বন্ধে যিনি সবচেয়ে ব্যাপক অথচ গভীরভাবে চিন্তা করেছেন তিনি এই অন্নশাস্ত্রের শাস্ত্রী নন, তিনি একজন প্রাণতত্ত্ববিদ আচার্য,

নাম চার্লস ডারউইন। ভৃগু-বরুণ প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে অন্নতত্ত্বের এক ধাপ উপরে উঠলে পাই প্রাণতত্ত্ব। সুতরাং প্রাণতত্ত্বজ্ঞ ডারউইন যে তার উপরের ধাপ থেকে অন্নের লীলা ব্যাপকতর ও স্পষ্টতরভাবে প্রত্যক্ষ করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ডারউইন পূর্বাচার্যদের কাছ থেকেই অন্নপ্রাণ-বিদ্যার এই বীজমন্ত্রটি পেয়েছিলেন যে পৃথিবীতে যত প্রাণী জন্মে তাদের সকলের প্রাণরক্ষার উপযোগী পর্যাপ্ত অন্ন বসুমতী জোগাতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন মন্ত্রই বহু বৎসর ধরে একান্ত নিষ্ঠা ও কঠোর সংযমেব সঙ্গে জপ করতে করতে পূর্বে যা কারও ভাগ্যে ঘটেনি তার সেই সিদ্ধি লাভ হল। অন্ন তার অদৃষ্টপূর্ব বিশ্বরুপ ডারউইনকে দেখালেন। তিনি দেখলেন স্থলে, জলে, আকাশে—-অরণ্যের ছায়ায়, মরুভূমির প্রান্তে, গাছের শাখায়, পর্বতের গহ্বরে, সমুদ্রের তলে, হ্রদের বুকে–অন্নের জন্য প্রাণের এক অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চলেছে। অন্ন পরিমিত, তার আকাঙ্ক্ষী জীব সংখ্যাহীন। এই পরিমিত অন্নকে আয়ত্ত করার জন্য প্রাণীতে প্রাণীতে, উদ্ভিদে উদ্ভিদে, উদ্ভিদে প্রাণীতে যে দ্বন্দ্ব, তা যেমন বিরামহীন তেমনি মমতাহীন। এ দ্বন্দ্বে কেহ কারও সহায় নয়। এ হল সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কখনও প্রকাশ হচ্ছে প্রকাশ্য যুদ্ধের রক্তোচ্ছাসে, কখনও নিঃশব্দে চলেছে। নীরব রক্তশোষী প্রতিযোগিতার আকারে। কোনটা বেশি ভয়ানক বলা কঠিন। অন্ন তার মোহিনী মূর্তিতে প্রাণকে আকর্ষণ করেছেন, আর আকৃষ্ট প্রাণীকে মহাকালের মূর্তিতে সংহার করছেন। শেষ পর্যন্তও যাদের উপর প্রসন্ন দৃষ্টি রাখছেন সেই ভাগ্যবানদের সংখ্যা অতি সামান্য। মৃত্যুর মরুভূমির উপর দিয়ে অন্ন তার সম্মোহন শঙ্খ বাজিয়ে চলেছেন। প্রতি মুহূর্তে প্রাণের জোয়ারে দুকুল ছাপিয়ে উঠছে, কিন্তু সে উচ্ছাস দু'পাশের তপ্ত বালুতেই শুষে নিচ্ছে। প্রাণের একটা অতি ক্ষীণ ধারা কোনওরকমে শেষ পর্যন্ত অন্নের পিছনে পিছনে চলেছে।

অন্নের এই মোহিনীমহাকালের যুগলমূর্তি দর্শন করে ডারউইন কাল জয় করে আমর হয়েছেন। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে অন্নের লীলার এখানেই শেষ নয়। প্রাণের ধারা চলতে চলতে একদিন মানুষে এসে ঠেকল। পৃথিবীতে প্রাণের ক্রমবিকাশ হতে হতে একদিন তা মানুষের মূর্তি নিয়ে প্রকাশ হল। কেমন করে হল সে কথা পণ্ডিতদের তর্ক-কোলাহলে অপণ্ডিত সাধারণের কানে আসা দুঃসাধ্য; তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এবার যে বিগ্রহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হল, সে বিগ্রহ অতি মনোরম, অতি বিস্ময়কর। তার সুঠাম, সরল, উন্নত দেহ, তার বন্ধনহীন মুক্ত বাহু, তার সতেজ ইন্দ্রিয়, তার সবল, অনাড়ষ্ট মাংসপেশি সবই যেন স্পষ্ট করে বলে দিল যে এ বিগ্রহ অরণ্যে পড়ে থাকবার নয়, এর জন্য একদিন সোনার দেউল গড়া হবেই হবে। তবুও প্রাণের এই প্রকাশের সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার তার এই মূর্তি নয়। তার চেয়েও লক্ষগুণে আশ্চর্য এক ব্যাপার সংঘটিত হল। যেমন বোধ হয় পৃথিবীতে প্রাণের যাত্রারম্ভের সঙ্গেই তার সাথে ছিল, অতি ক্ষীণ অদৃশ্যপ্রায় অবস্থা থেকে নানা মূর্তির মধ্য দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, মানুষের মূর্তিতে পৌঁছে সে একবারে দীপ্ত সূর্যের মতন জ্বলে উঠল। তার উজ্জল দীপ্তিতে মানুষ পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখল যে এ বিপুল ধরিত্রী তারই রাজত্ব।

অন্ন তাঁর নিজের শক্তি সেইদিন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করলেন যেদিন এই মানুষও, রাজটীকা ললাটে নিয়ে, কঙালের মতো তাঁর পিছু পিছু পৃথিবীময় ছুটে বেড়াতে লাগল। একটা ফলের জন্য দশটা গাছের তলায়, একটা শিকারের খোঁজে এক অরণ্য হতে আর এক অরণ্যে ঘুরে ঘুরে, পরে অন্নকে কিছু সুলভ করে একটু সুস্থির হওযার চেষ্টায় গোটাকয়েক প্রাণীকে যদি পোষ মানালে, তবে সেই প্রাণীরূপ অন্নের অন্ন খুঁজতে এক দেশ হতে আর এক দেশে চলতে চলতে তার পায়ে ব্যথা ধরে উঠল। এই অজ্ঞাতবাসের দুঃসহ দৈন্যে মানুষের বহুযুগ কেটে গেল। শেষে এক দিন পরম শুভক্ষণে ক্লান্তদেহ, ক্ষুব্ধ চিত্ত মানুষ বলে উঠল। আর অন্নের আশায় তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াব না, অন্নকে সৃষ্টি

করব, স্বল্প অন্নকে বহু করব। সেদিন নিশ্চয়ই স্বর্গের তোরণে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠেছিল; দিব্যাঙ্গনারা মর্ত্যচক্ষুর অদৃশ্য হেমঘটে অভিষেকবারি এনে মানুষের মাথায় ঢেলেছিলেন; ইন্দ্রদেব এসে সোনার রাজমুকুট তার মাথায় পরিয়েছিলেন; আর সমস্ত আকাশ ঘিরে দেবতারা প্রসন্ন নেত্রে দীর্ঘ বনবাসের পরে মানুষের নিজ রাজ্যে অভিষেক চেয়ে দেখেছিলেন।

কৃষি আরম্ভ হল। প্রাণের ধাপ থেকে মনের ধাপে উঠে মানুষ দেখল যে এখানে দাড়ালে অন্ন এসে আপনিই হাতে ধরা দেয়, তাকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াতে হয় না। এখানে বসে তপস্যা করলে কালো মাটির বুক চিরে সোনার ফসল বাইরে এসে পৃথিবী ঢেকে ফেলে; দিনের অন্ন দিন খুঁজে প্রাণান্ত হতে হয় না। মানুষ জানল, 'পৃথিবী বা অন্নম, পৃথিবীই অন্ন। মাটির তলে জলের অফুরন্ত ধারার মতো মাটির মধ্যে অন্নেরও অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকানো আছে, লাঙলের ফালে তাকে তুলে আনতে জানলে অন্নের দৈন্য দূর হয়; যে মন্ত্র ডারউইন জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার শক্তিকে ব্যর্থ করা যায়। মাটির সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন হল। মাটির টানে উদ্ভ্রান্ত বনাচারী গৃহী হল। সেইদিন মানুষের স্বদেশ, সমাজের প্রতিষ্ঠা হল, মানুষের গ্রাম নগর গড়ে উঠল, শিল্প বাণিজ্যের শুরু হল। পৃথিবীর আদিম অরণ্য কেটে সভ্যতার সোনার মন্দিরে মানুষের প্রতিষ্ঠা হল।

কিন্তু প্রাণের ভূমি থেকে আরম্ভ করে মানুষের এই যে যাত্রা, এখানেই তার শেষ হয় নাই। মন যখন সৃষ্টির ক্ষমতায় পরিমিত অন্নকে বহু করে অন্নের দাসত্বের লোহার বেড়ি মানুষের পা থেকে খুলে নিল, বিরামহীন অন্নচেষ্টা থেকে তাকে মুক্তি দিল, তখনই মানুষের স্বভাবের যেটি পরমাশ্চর্য অংশ, সেটির বিকাশ হল। মানুষ দেখল যে কেবল অন্নে তার তৃপ্তি নাই, তার পরিমাণ যতই অপর্যাপ্ত হোক, তার প্রকার যতই বিবিধ হোক। প্রাণের

তাড়নায় অন্নের খোঁজে আকাশ, বাতাস, পৃথিবীকে জানতে আরম্ভ করে মানুষ বুঝল যে তার স্বভাবে একটা কী আছে যেটা কেবল জানার দিকে তাকে ঠেলে দেয়। অন্নের সৃষ্টি আরম্ভ করে সে জানল যে তার প্রকৃতির যেটা অন্তরতম অংশ, সেটা কেবল সৃষ্টির আনন্দেই সৃষ্টি করে যেতে চায়। মানুষ যেন প্রাণীরাজ্যের রাজা হলেও অপ্রাণ-লোকেরই অধিবাসী। সে যেন বিদেশি রাজপুত্র পরদেশে এসে রাজত্ব পেয়েছে, কিন্তু তার অন্তরাত্মার নাড়ির টান স্বদেশের দিকেই। প্রাণের জগতে মানুষের এই যে উদ্দেশ্যহীন জানা আর অনাবশ্যক সৃষ্টি তাই হল তার বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, কাব্য, কলা, শিল্প। মানুষের প্রাণ বলে এদের মূল্য এক কানা কড়িও নয়; তার অন্তর জানে এরাই তার যথাসর্বস্ব, অন্নের চেয়েও কাম্য, প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

এই হল মানুষের সভ্যতার অন্ন আর প্রাণের ভূমি থেকে মনের সিঁড়ি দিয়ে বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে যাত্রার ভ্রমণ-কাহিনি। এই লোকে পৌছিলেই অন্নের দাসত্ব থেকে মানুষের যথার্থ মুক্তি। মানুষ যদি কেবল অন্নকে আয়ত্ত করেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারত তা হলে অন্নদাস হলেও মানুষের জীবনে তার সর্বব্যাপী প্রভুত্বের কোনও অপচয় হত না। সোনাব শিকলে অন্নকে বাধলেও শিকলের অন্য দিকটা মানুষের গলাতেই পরানো থাকত, অন্নের টানে পৃথিবীময় না ঘুরতে হলেও সারাক্ষণ অন্নকে টেনেই পৃথিবীতে চলতে হত। এই বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে পৌছিতে জানলেই মানুষের গলা থেকে এই অন্নের শিকল খোলার উপায় হয়। আমাদের ঋষিরা সংসারচক্র থেকে জীবের মুক্তির কথা বলেছেন। এই হল মানুষের সভ্যতার অন্নচক্র থেকে মুক্তির পথ।

যদি কারু মনে হয় যে মনের বলে মানুষের আয়ত্ত হয়ে, তাকে বিজ্ঞান আর আনন্দোব পথেব যাত্রী দেখে, মানবজীবনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে, অন্ন চিবদিনের জন্য নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে, তবে তিনি অন্নের প্রভাব এবং মাহান্ত্র্যের কথা কিছুই জানেন না। মানুষেব সভ্যতার যে যে মুক্তির কথা বলেছি সে হল শাস্ত্রে যাকে বলে জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ দেহও আছে, মুক্তিও হয়েছে। সুতরাং মানুষের দেহ আর প্রাণ যখন আছে তখন তার অন্নের উপর একান্ত নির্ভর আছেই আছে। এই ছিদ্র ধরে অন্ন অতি নিপুণ সেনাপতির মতো এক নূতন পথ দিয়ে তার বল চালনা করে মানুষকে বন্দি করবার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন দ্বন্দ্বটা চলেছে, কেবল অবস্থার পরিবর্তনে 'ষ্ট্র্যাটেজি'র প্রভেদ ঘটেছে মাত্র।

যতদিন মানুষ কেবল প্রাণী ছিল, তার মনের পূর্ণ বিকাশ হয়নি, বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের বার্তা তার অজ্ঞাত ছিল, ততদিন অন্নের দৃষ্টি ছিল মানুষের প্রাণের উপর। যেমন ইতর প্রাণীকে তেমনি মানুষকেও নিজের রথের চাকায় বেঁধে, অন্ন তার জীবন-মৃত্যুর উপব কর্তৃত্ব করত। এই যুদ্ধে অন্ন জয়ী হয়েছিল নিজেকে বিরল করে, আপনাকে দুর্লভ করে। মানুষের মন যখন অন্নকে বহু ও সুলভ করে এই উপায়টা ব্যর্থ করল সেইদিন থেকে অন্নের দৃষ্টি পড়েছে মানুষের বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের দিকে। অন্ন জানে যে ওরাই তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের জীবনে যদি ওদের আবির্ভাব না হত, তা হলে নামে প্রভু হলেও রোমের শেষ সম্রাটদের মতো মানুষ দাস অন্নের দাসত্বই করত। কাজেই অন্নেরা এখন চেষ্টার বিষয় হয়েছে মানুষের সভ্যতার ওই বিজ্ঞান আর আনন্দের লোকটা ধ্বংস করা। আর প্রাণকে আয়ত্ত করার প্রাচীন চেষ্টার ব্যর্থতার মধ্যেই অন্ন এই নূতন যুদ্ধের অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে। দুর্লভ অন্নকে বহু করে মানুষ সভ্যতা গড়েছে। এই বহু অন্ন অসংখ্য মাোহিনী মূর্তিতে মানুষকে ঘিরে তার বিজ্ঞান আর আনন্দলোকের পথরোধের চেষ্টা করছে। বিরলতার ক্ষয়রোগে মানুষের সভ্যতাকে ধবংস করতে না পেরে বাহুল্যের মেদরোগে

তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা বন্ধ করবার চেষ্টা দেখছে। অন্ন এখন মহাকালের মূর্তি ছেড়ে কুবেরের মূর্তি ধরেছে। মানুষের কত সভ্যতা মহাকালের করালে দংষ্ট্রা হতে উদ্ধার পেয়ে স্থূলোদর ভোগপ্রসন্নমুখ কুবেরের মেদপুষ্ট বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে নিশ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেছে!

মানুষের সভ্যতার সঙ্গে অন্নের এই দ্বন্দ্ব নূতন নয়, এ দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীন। সভ্যতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এ দ্বন্দ্বেরও আরম্ভ হয়েছে এবং বোধ হয় শেষ পর্যন্তই চলবে। কখনও সভ্যতা জয়ী হয়েছে, কখনও বা অন্নেরই জয় হয়েছে। মানুষে মানুষে শেষ যুদ্ধের বর্তমান কল্পনার মতো এ যুদ্ধের শেষ কল্পনাও হয়তো কেবল স্বপ্ন। হয়তো মানুষের সভ্যতাকে চিরদিনই এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উঠে পড়ে চলতে হবে।

এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষের সভ্যতা রক্ষা পেয়েছে, কেননা যুগে যুগে এমন সব জাতি উঠেছে। যাঁরা অন্নের মায়াকে অতিক্রম করে আনন্দের পথে চলতে পেরেছে। ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আধুনিক বাঙালি সেই সব জাতির অন্যতম। সভ্যতার এই প্রাচীন যুদ্ধে নবীন সেনাপতি হবার যোগ্যতা এদের মধ্যে আছে। অন্নের মহাকাল-মূর্তিতে ভয় পেয়ে যাঁরা এই জাতিকে কুবেরের কোলে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান, তাদের মাথায় বুদ্ধি থাকতে পারে, কিন্তু চোখে দৃষ্টির অভাব। আনন্দলোকের সূর্যরশ্মি বিজয়মাল্যের মতো এদের মাথায় এসে পড়েছে; হিতৈষীদের শত চেষ্টাতেও সে বরণকে উপেক্ষা কবে কেবল অন্নকে বহু করার চেষ্টাতেই এ জাতি কখনও জীবন উৎসর্গ করতে পারবে না।

‘অন্নং ন নিন্দ্যাৎ’, অন্নেব নিন্দা করিনে। অন্নং বহুকুর্বীত’; অন্নকে বহু করার যে কত প্রয়োজন তাও জানি। সেই ভিত্তির উপরেই মানুষের সভাতা দাঁড়িয়ে আছে। সমস্যা এই, কেমন করে অন্নকেও বহু করা যায় আবার তার

বাহুল্যকেও বর্জন করা যায়। মহাকালের দর্শনেও ছিন্ন হতে না হয়, কুবেরের গদাও চূর্ণ না করে।

এস নুতন যুগের নবীন বাদরায়ণ! 'অথাতোহান্ন জিজ্ঞাসা' বলে তোমার অন্নসূত্র আরম্ভ করে এই সংশয়ের সমাধান কর। কোন মধ্যযান পথের পথিক হলে মানুষের সভ্যতাকে আর আনন্দের ব্রহ্মালোক হতে ফিরে আসতে না হয় তার নির্ধারণ করা।

আশ্বিন ১৩২৪

রোম

জোর করে লেগে থাকলে দেখছি অসাধ্যও সাধন করা যায়। এভরিম্যানের অনুবাদে চার ভ্যালুম মমসেনের রোমের ইতিহাস শেষ হয়ে গেল। অবশ্য এ পুথির শেষে পৌঁছে দেখি গোড়ার দিককার অনেক কথা, মনের মধ্যে ঝাপসা হয়ে এসেছে। কেল্টজাতির স্বাধীনতা রক্ষার নিস্ফল চেষ্টার করুণ কাহিনি, স্যামনাইটদের রোমের নাগপাশ থেকে মুক্তির বৃথা প্রয়াসের ইতিহাসকে একরকম ঢেকে ফেলেছে। সিজারের জয়ধ্বনিতে, হ্যানিবালের স্তুতিগানও প্রায় ডুবে গেছে। সন তারিখের তো কথাই নাই। প্রথম থেকেই তার গোলযোগ শুরু হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত সব একাকার হয়ে গোলযোগের সম্ভাবনারও লোপ ঘটেছে। মোট কথা, রোমের ইতিহাসে পরীক্ষা দিতে বসলে

যে, সে পরীক্ষাতে ফেল হব। এটা নিশ্চয়। তবুও ল্যাটিন জাতির বিজয়যাত্রার এই অধ্যায়গুলি, মমসেনের বর্ণনায় মনের মধ্যে যে দাগ কেটে গেছে, তা সহসা মুছে যাবে না। ভূমধ্যসাগরের চার পাশের যে ভুখণ্ডকে আধুনিক যুগের রোমের ঐতিহাসিকেরাও পৃথিবী বলেই উল্লেখ করেন, তার বহু রাজ্য ও বিচিত্র জাতিগুলির রোমের এক-রাট ও একছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মনকে যে দোলা দিয়েছে, তার বেগ শেষ হতে কিছু সময় লাগবে।

পাঠকেরা শঙ্কিত হবেন না। মমসেন থেকে দুটো অধ্যায় ইংবেজি অনুবাদের বাংলা তর্জমা করে দিয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকপদ লাভের কোনও চেষ্টাই করব না। রোম সম্বন্ধে এখানে যা কিছু বলতে যাচ্ছি তা নিতান্তই এলোমেলো রকমের। তাতে প্রত্নতত্ত্বের পাণ্ডিত্য এবং ইতিহাসের গাম্ভীর্য—এ দুয়েব অত্যন্ত অভাব। সুতরাং যাঁরা প্রবন্ধের নাম দেখে পড়তে শুরু করেছেন তাঁরা হয়তো আর অগ্রসর না হলেই ভাল করবেন। আর যাঁরা নাম দেখেই পাতা উলটে যেতে চাচ্ছেন, তাঁরা ধ্রুস্কার শেষ পর্যন্ত পড়বার চেষ্টা কবলেও করতে পারেন।

২

প্রাচীন হিন্দুজাতি এবং তাদের সভ্যতা আমাদের পশ্চিমের মাস্টারমশায়দের কাছে অনেক রকম গঞ্জনা শুনেছে। তিরস্কারের একটা প্রধান বিষয় এই যে বংশপরিচয়ে তাঁরাও ছিলেন রোমানদেরই জ্ঞাতি। সুতরাং সেই একই রক্ত শরীরে থাকতে তাঁরা যে কেমন কবে হিন্দুসভ্যতার মতো এমন দুর্বল ও বিকৃত সভ্যতা গড়ে বসলেন, এটা পণ্ডিতদের মনে যেমন বিরাগেরও সঞ্চার করেছে তেমনি জিজ্ঞাসারও জন্ম দিয়েছে। এবং এই সংশয়ের সমাধানে তাঁরা নানারকম সম্ভব-অসম্ভব, অবশ্য সকলগুলিই 'বৈজ্ঞানিক', মতবাদের প্রচার

করেছেন। গল্প আছে, ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় চার্লস রয়েল সোসাইটির নতুন প্রতিষ্ঠা করে পণ্ডিতদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন যে, মাছ মরলেই ঠিক সেই সময়টা তার ওজন বেড়ে যায় কেন? পণ্ডিতেরা উত্তর খুঁজে গলদঘর্ম হয়ে গেলেন। অবশেষে একজন বললেন, আচ্ছা দেখাই যাক না ওজন করে, মাছটা মরলেই তা যথার্থ বেশি ভারী হয়ে ওঠে কি না। মমসেনের বিপুলায়তন পুথি শেষ করে এই কথাটাই বারবার মনে হয়েছে, যে যাঁরা এই রোমানসভ্যতার তুলনায় প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতাকে অতি খাটো ও নিতান্ত হালকা বলেছেন, 'সভ্যতা' বলতে তাঁরা কী বোঝেন? সভ্যতার কোন মাপকাঠিতে তাঁরা এই দুই সভ্যতাকে মাপ করেছেন? কোন তৌলে এদের ওজনে তুলেছেন? এই যে রোমানসভ্যতা, যার গৌরবের দীপ্তিতে পণ্ডিতদের চোখ ঝলসে গেছে, এ তো একটা একটানা পরের দেশ জয় ও অন্য জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাস। প্রথম 'লেশিয়ামের' উপর রোমের প্রভুত্ব বিস্তার, তারপর তারই সাহায্যে উত্তরের ইট্রাসকানদের ধবংস করে ইতালির আর সকল জাতিগুলোকে পিষে ফেলে গোটা দেশটায় নিজের আধিপত্য স্থাপন। আবার মেডিটারেনিয়নের ওপারের প্রবল রাজ্যটি, সিসিলির সেতু পার হয়ে এই আধিপত্যের কোনও বিঘ্ন ঘটায়, এই আশঙ্কাতেই কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বিজিত ইতালির সাহায্যে তাকে সমুলে উচ্ছেদ; এবং কার্থেজের অধিনায়ক 'হ্যামিলকার বারকা' বা বিদ্যুতের বংশধর, স্পেন থেকেই যাত্রা শুরু করে বাজ হয়ে রোমের মাথায় ভেঙে পড়েছিল বলে, শত্রুর শেষ রাখতে নাই এই নীতি অনুসারে স্পেনেও রাজ্যবিস্তার। এমনি করে দক্ষিণ আর পশ্চিমের ভাবনা যখন ঘুচল তখন স্বভাবতই দৃষ্টি গেল পুবের দিকে। গায়ে জোর থাকলে এ আশঙ্কার তো আর শেষ নাই! পুবে তখন ছিল আলেকজেন্ডারের ভাঙা সাম্রাজ্যের গোটা কয়েক বিচ্ছিন্ন টুকরো। ওরই মধ্যে যে দুটি একটু প্রবল–ম্যাসিডন আর এশিয়া, তাঁরা তখন রোমেরই মতো আশপাশের রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় ছিল। এ ব্যাপারকে

অবশ্য উপেক্ষা কি মার্জনা কিছুই করা চলে না। কেননা পরের দেশ জয় করে রাজা ও বলবুদ্ধি জিনিসটি মানুষের ইতিহাসের আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক জাতিরই নিজের পক্ষে খুব সুসঙ্গত ও অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্য সকলের বেলাই নিতান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে মনে হয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়েই রোমকে এ দুটি রাজ্য আক্রমণ করতে হল; এবং এদের বাহুল্য অংশগুলি ছেটে ফেলে যাতে এরা অতঃপর বেশি। নড়াচাড়া না করে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হল। এমনকী সঙ্গে সঙ্গে রোম একটা মহানুভবতার পরিচয় দিতেও কসুর করলে না। ইতালিতে তখন হেলেনিক সভ্যতার স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে। তারই গুরুদক্ষিণা হিসাবে গ্রিসের ছোট ছোট নখদন্তহীন নাগরিক রাজ্যগুলিকে ম্যাসিডনের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করে রোম তাদের একবারে স্বাধীনতা দিয়ে দিল। কিন্তু দুঃখের কথা মহানুভবতার এ খেলাও রোম বেশিদিন খেলতে পারল না। কারণ দানে পাওয়া স্বাধীনতার মানেই হল–স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগটা করতে হবে দাতারই ইচ্ছা অনুসারে। সুতরাং গ্রিসের চপল প্রকৃতির লোকগুলি যখন নিয়মের ব্যতিক্রম করে, ম্যাসিডনের আবার মাথা তুলবার চেষ্টা দেখে, তাকেই নায়ক ভেবে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ করল, তখন এই পুবের দেশগুলির আধা স্বাধীনতা আধা অধীনতার বিশ্রী অবস্থাটা ঘুচিয়ে সোজাসুজি এদের করায়ত্ত করে নেওয়া ছাড়া রোমের আর গত্যন্তর থাকল না। এর পর রোমান চোখের দিকচক্রবালে যে দুটি রাজ্য বাকি থাকল, সিরিয়া আর মিশর, তাদের নিয়ে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হল না। অবস্থা দেখে তাঁরা আপনারাই এসে রোমের পায়ে মাথা ঠেকালে। সাম্রাজ্য যখন গড়ে উঠল তখন কাজে কাজেই তার বৈজ্ঞানিক চৌহদি'রও খোজ পড়ল। কৃষ্ণসাগরতীরের মিথরেডেটিস-এর রোমের শিকল ভেঙে হাত পা ছড়াবার দুরাকাঙক্ষা দমন উপলক্ষে, রাজ্যের পুব-সীমা ইউফ্রেটিসে গিয়ে ঠেকাল এবং স্বয়ং জুলিয়াস কেল্টদের মৃতদেহের উপর দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আটলান্টিক পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্রাটেরও

আবির্ভাব হতে খুব বেশি বিলম্ব ঘটল না। কেননা তিনশো বছর রাজ্যজয়ে আর রাজ্যভোগে প্রাচীন রোমান বল-বীর্য-ঐক্য সকলেরই তখন লোপ হয়েছে। প্রকৃতির পরিশোধা! আর পররাজ্যজয়ে যে সাম্রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধজয়ী সেনাপতি তার নায়কত্ব না পেলেই বরং বিস্ময়ের কারণ হত। সিজারের উত্তরাধিকারীরা আরও তিনশো। বছর ধরে এই রোম-সাম্রাজ্য, যাকে কোনওরকমেই আর রোমাঞ্চন সাম্রাজ্য বলা চলে না, শাসন ও রক্ষা করলেন। রাজ্যের সকল জাতির লোকের মধ্যে রোম-নাগরিকের অধিকার ছড়িয়ে দেওয়া হল, কেননা তখন সকলেই রোম-সম্রাটের সমান প্রজা, 'ফেলো সিটিজেনের অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ফেলো সাবজেক্ট'। উচু আশা ও বড় আকাঙক্ষার তাড়না না থাকলে যে শান্তি আপনিই আসে, রাজ্যজুড়ে সে শান্তি বিরাজ করতে লাগল। ঘরকন্নার ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের উপযোগী পাকা আইন-কানুন এই বহুজাতি ভূয়িষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে গড়ে উঠল। তারপর মানুষের গড়া অপর সকল রাজ্যের মতো রোম-সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়ল। ইউরোপের সভ্যতার কেন্দ্র ভূমধ্যসাগর ছেড়ে আটলান্টিক মহাসাগরকে আশ্রয় করল। তারই তীরে তীরে নবীন সব জাতির মধ্যে মানুষের সভ্যতার চির-পুরাতন ও চির-নূতন খেলার আরম্ভ হল।

৩

এই যে ছয়-সাতশো বছরের রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসনের পলিটিক্যাল ইতিহাস, রোমান সভ্যতা ও গৌরবের কাহিনিরও এই হল অন্তত চোদে আনা। একে বাদ দিলে রোমান সভ্যতার যা অবশিষ্ট থাকে তার গৌরবের কাছে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কথা দূরে থাক, তার চেয়ে অনেক ছোট সভ্যতারও মাথা নিচু করার কোনও কারণ দেখা যায় না। হেলেনিক সভ্যতার দৃষ্টান্তটি চোখের

সামনে থাকতে নিজেদের সভ্যতার এই স্বরূপ সম্বন্ধে রোমানদের মনেও সংশয়ের কোনও অবসর ছিল না। আগস্টসের সভাকবি তার যুগের আত্মবিস্মৃতি রোমানদের প্রকৃত রোমান-গৌরব স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলছেন, 'জানি আর আর সব জাতি আছে যাঁরা কঠিন ধাতুকে সুষমাময় গড়ন দিতে পারে, পাথরের হিম দেহ থেকে প্রাণের বিপুল উচ্ছ্বাস খুঁড়ে বের করতে পারে, জ্ঞানের আঙুল আকাশে তুলে নক্ষত্রলোকেরও সকল বার্তা একে দেখাতে পারে, কথার সঙ্গে কথা গেথে লোকের করতালি নিতেও তাঁরা পটু, কিন্তু রোমান, এসব কাজ তোমার নয়। তোমার কাজ হল–সকল জাতির উপর রাজত্ব করা। সেই হল তোমার শিল্পকলা। তোমার গৌরব হল বিজিত রাজ্যে শান্তি আনা, উচুমাথাকে যুদ্ধে নিচু করা, পতিত যে শত্রু তাকে করুণা দেখান।' 'এনিড' যে ইতিহাস নয়, কাব্য, পতিত শত্রুকে করুণা দেখানের কথা বলে ভার্জিল বোধ হয় তারই ইঙ্গিত করেছেন। কেননা রোমের ইতিহাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ বস্তুটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যাহোক, লাতিন কবির রোমান সভ্যতা ও গৌরবের এই বর্ণনাটি আধুনিক কালের রোমানতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরাও একরকম সকলেই মেনে নিয়েছেন। কারণ না মেনে উপায় নাই। এবং এরই মধ্যে মানুষের সভ্যতা, প্রকৃতি ও শক্তির বিরাট বিকাশ দেখে তাঁরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। মানি, বহু জাতিকে যুদ্ধে পরাজয় করতে হলে জাতির মধ্যে যে বীর্য, যে ঐক্য, যে রাজনৈতিক বুদ্ধি ও বন্ধনের প্রয়োজন, তার মূল্য কিছু কম নয়। কিন্তু এই বস্তুকে সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠ বিকাশ বললে মানুষের প্রকৃতিকেই অপমান করা হয়। আর জাতির এই বীর্য, ঐক্য ও বুদ্ধি যখন পরের দেশ জয় ও পরের উপর আধিপত্যেই নিঃশেষে ব্যয় হয়, তখন তার শক্তি দেখে অবশ্য স্তম্ভিত হতে হয়, যেমন কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্তিতে মানুষ স্তম্ভিত হয়। প্রকৃতপক্ষে একটা সমগ্র জাতি, নবীন শক্তি সঞ্চারের আকস্মিক উন্মাদনায় নয়, কিন্তু যেমন মমসেন দেখিয়েছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীর

সূক্ষ্ম লাভ লোকসানের হিসাবে গণনা করে চোখের সুমুখে যখনই যাকে প্রবল বা বর্ধিষ্ণু দেখেছে তারই বুকের উপর পড়ে তার জীবনের বল নিঃশেষে শুষে নিয়ে নিজেকে পুষ্ট করেছে, রোমান ইতিহাসের এই ব্যাপারটি তার ভীষণতায় মানুষকে স্তম্ভিত না করেই পারে না; খ্রিস্টান ও পারসি পুরাণে যে অন্ধকার ও অমঙ্গলের দেবতার কল্পনা আছে সেটা ভিত্তিহীন নয় বলেই মানুষের বিশ্বাস জন্মায়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রোমের এই প্রবল পলিটিক্যাল সভ্যতা, কেবল সমসাময়িকদেরই মাথা ভয়ে হেঁট করিয়ে রাখেনি, কিন্তু উত্তরকালের ঐতিহাসিকদেরও শ্রদ্ধায় নতমুণ্ড করে রেখেছে। প্রাণতত্ত্ববিদেরা হয়তো বলবেন মানুষ পশুরই বংশধর; শক্তির বিকাশ দেখলেই পূজা না করে থাকতে পারে না। মমসেন বলেছেন, এথেন্স যে রোমের মতো রাষ্ট্র গড়তে পারেনি, সে জন্য তার দোষ ধরা মূর্খিতা। কেননা গ্রিক প্রকৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও যা কিছু বিশেষত্ব, তা ছিল তেমন একটা রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রতিকূল। অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে বরণ না করে, গ্রিসের পক্ষে জাতীয় একতা থেকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যে পৌঁছান সম্ভব ছিল না। সেই জন্য গ্রিসে জাতীয় একত্বের যখনই বিকাশ ঘটেছে সেটা কোনও রাষ্ট্রীয় ভিত্তির উপর ভর করে নয়। অলিম্পিয়ার ক্রীড়াঙ্গন, হোমারের কবিতা, উরিপিডিসের নাটক, এইসবই ছিল হেলাসের ঐক্য বন্ধন। ঠিক আবার তেমনি ফিডিয়াস কি আরিস্টফেনিসের জন্ম দেয়নি বলে রোমকে অবহেলা করা অন্ধতা। কেননা রোম স্বাধীনতার জন্য স্বাতন্ত্র্যকে, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা ও শক্তিকে নির্মমভাবে দমন করেছে। ফলে হয়তো ব্যক্তিগত বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে, প্রতিভার ফুলও মুকুলেই ঝরে পড়েছেঃ কিন্তু তার বদলে রোম পেয়েছে স্বদেশের উপর এমন মমত্ববোধ ও ‘পেট্রিয়টিজম’, গ্রিসের জীবনে যার কোনওদিন প্রবেশ ঘটেনি। এবং প্রাচীন সভ্যজাতিগুলির মধ্যে রোমই স্বাধীন রাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর জাতীয়-ঐক্যের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হয়েছে। সেই

জাতীয়-ঐক্যের ফলে কেবল বিচ্ছিন্ন হেলিনিক জাতির উপরে নয়, পৃথিবীর সমস্ত জানা অংশের উপর প্রভুত্ব, তাদের করতলগত হয়েছিল।

আমাদের শাস্ত্রে ‘পুরুষের’ শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, তাই শেষ, তাই ‘পরা গতি’। পরিচিত সমস্ত পৃথিবীর উপর অবাধ প্রভুত্ব কি মানবসভ্যতার ‘পুরুষ, তার ‘কাষ্ঠা’ ও ‘পরা গতি’! এ প্রভুত্ব তো কালে উঠে কিছুকালের পরই বিলোপ হয়; মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছুই স্থায়ী সম্পদ রেখে যায় না। আমার সুমুখে উরিপিডিসের কয়েকখানি নাটক রয়েছে। এগুলি তো কেবল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর হেলাসের ঐক্য-বন্ধন নয়। তেইশশো বছর আগেকার এথেন্সের নাগরিকের মতো আমিও যে আজ সে কাব্যের রসে মেতে উঠছি। এগুলি যে চিরদিনের জন্য মানবসভ্যতার অক্ষয় মঞ্জুষায় সঞ্চিত হয়ে গেছে। যুগের পর যুগ বিশ্বজন এর সুধা আনন্দে পান করবে। আর রোমের প্রভুত্ব?–সেটি রয়েছে— ওই মমসেনের পৃষ্ঠায়। এই যে প্রভেদ, এ তো মমসেনের চার ভালুমও মুছে ফেলতে পারেনা। একে কেবল মানুষের সভ্যতার প্রকার ভেদ বলে আপস-মীমাংসার চেষ্টায় কোনও ফল নাই। এর একটির চেয়ে আর-একটি শ্রেষ্ঠ, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ; যেমন জড়ের চেয়ে জীবন শ্রেষ্ঠ, প্রাণের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ।

মানুষের সভ্যতার ধারা দুই। এক ধারা বয়ে যাচ্ছে–কেবলই কালের মধ্য দিয়ে— জাতিকে, সভ্যতাকে ভাসিয়ে নিয়ে স্মৃতি ও বিস্মৃতির মহাসাগরে মিশিয়ে দিচ্ছে। নূতন জাতি, নূতন সভ্যতার স্রোত এসে ধারার প্রবাহকে সচল রাখছে। আর এক ধারা জন্ম নিয়েছে কালেরই মধ্যে, কিন্তু কালকে অতিক্রম করে ধ্রুবলোকে অক্ষয় স্রোতে নিত্যকাল প্রবাহিত হচ্ছে। নূতন স্রোত এসে এ ধারাকে পুষ্ট করছে, কিন্তু এতে একবার যা মিশছে, তার আর ধ্বংস নেই, তা অচ্যুত। কেননা এ লোকে তো পুরাতন কিছু নেই, সবই সনাতন, অর্থাৎ

চিরনূতন। সভ্যতার সৃষ্টির এই যে নশ্বর দিকটা এ কিছু তুচ্ছ নয়। এইখানেই বিবিধ মানবের বিচিত্র লীলা, সমাজ গঠনে, রাষ্ট্র নির্মাণে, শৌর্যে, বীর্যে, মহত্ত্বে, হীনতায় চিরদিন তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। হোক না এ মৃত্যুর অধীন, তবুও জীবনের রসে ভরপুর। কিন্তু মানুষ তো কেবল জীব নয়। সে যে মর-আমরের সন্ধিস্থল। মৃত্যুর পথে যাত্রী হয়েও সে অমৃতলোকেরই অধিবাসী। তাই তার সৃষ্টির যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ সেটা কালের অধীন নয়। তার ইতিহাস আছে কিন্তু তা ঐতিহাসিক নয়। সেখানে যে ফুল একবার ফোটে তার প্রথম দিনের গন্ধ সুষমা চিরদিন অটুট থাকে; যে ফল একবার ফলে, রসে আস্বাদে তো চিরদিন সমান মধুর।

দুই সভ্যতার যদি শ্রেষ্ঠত্বের মীমাংসা করতে হয়, তবে মানুষের সভ্যতার এই অক্ষয় ভাণ্ডারে কার কতটা দান, তাই হল বিচারের প্রধান কথা। এ মাপকাঠিতে মাপলে, রোমান সভ্যতা গ্রিক কি হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে এক ধাপে দাড়াতে পারে না। তাকে নীচে নেমে দাঁড়াতে হয়। যত দিন তার সাম্রাজ্য ছিল, তত দিন তার বলের কাছে–সবারই মাথা নিচু করে থাকতে হয়েছে। কিন্তু উত্তরকালের লোকেরা কেন তার কাছে সম্রামে নতশির হবে? তাদের জন্য তো সে বিশেষ কিছু সঞ্চয় করে রেখে যায়নি। তার যা প্রধান দাবি, তার পলিটিক্যাল শক্তি ও বুদ্ধি, তার পাওনা তো তার সমসাময়িকেরা একরকম ষোলো আনাই মিটিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাছে সে দাবির জোর খুব বেশি নয়। তার গৌরবের চোদে আনা হল তার ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস জীবনের কাহিনি হলেও জীবন নয়, কেবলই কাহিনি। তার পৃষ্ঠার সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই। একজন ফরাসি পণ্ডিত রোমানদের দার্শনিক আলোচনা সম্বন্ধে বলেছেন যে, সেগুলি এখন বক্তৃতা-শিক্ষার ইস্কুলের ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধের মতো মনে হলেও যাদের জন্য সেগুলি লেখা হয়েছিল তাদের জীবনে ওর প্রভাব ছিল খুব বেশি। সুতরাং এ সব দার্শনিকের মূল্য বুঝতে হলে সেই সময়কার রোমের ইতিহাসের সঙ্গে সে-সব

মিলিয়ে পড়তে হবে। হায় রোম, তোমার দার্শনিক চিন্তারও ইতিহাসের হাত থেকে মুক্তি নাই!

৪

রোমের পলিটিক্যাল গৌরবের গুণগান মুখে যতই কেন থাকুক না, রোমান সভ্যতার এই প্রকৃতিটি পণ্ডিতদের মনে অস্বস্তির সঞ্চার না করে যায়নি। সেই জন্য ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা, রোমের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের কাছে কেমন করে কতটা ঋণী, মমসেন তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং ছোট বড় মাঝারি সকল পণ্ডিতই তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। সে ব্যাখ্যার প্রধান কথাটা এই—রোম সাম্রাজ্যের প্রাচীর যদি বর্তমান ইউরোপীয় জাতিগুলির অসভ্যকল্প পূর্বপুরুষদের ঠেকিয়ে না রাখত, তবে তাঁরা যখন রোম সাম্রাজ্যের উপরে পড়ে তাকে ধ্বংস করেছিল, সে ঘটনাটি ঘটত আরও চারশো বছর আগে। এবং তা হলে বিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে–স্পেনে, গলে, ড্যানিউবের তীরে তীরে, আফ্রিকায়, হেলেনিক সভ্যতার নব সংস্করণ মেডিটারেনিয়ন সভ্যতা যে শিকড় বসাতে সময় পেয়েছিল, তা আর ঘটে উঠত না। আর তার ফল হত এই যে, ওই অর্ধসভ্য জাতিগুলি ওই সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তা কখনও গড়তে পারত না।

মানুষের ইতিহাসে যে ঘটনাটা একরকমে ঘটে গেছে, সেটা সেরকম না ঘটে অন্য রকম ঘটলে তার ফলাফল কী হত এ তর্ক নিরর্থক। তাতে ‘স্বপ্নলব্ধ’ ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং রোম সাম্রাজ্যকে তার চৌকিদারির প্রাপ্য প্রশংসাটা নির্বিবাদেই দেওয়া যাক। কিন্তু এ তো রোমান

সভ্যতার কোনও গৌরবের কাহিনি নয়! এবং রোম সাম্রাজ্যকে যাঁরা চারশো বছর ধরে রক্ষা করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার মুখ চেয়ে তা করেননি! আর এটাও যদি গৌরবের কথা হয় তবে রোমকে আরও একটা গৌরবের জন্য পূজা দিতে হয়। সে হচ্ছে ঠিক সময়ে সাম্রাজ্যের প্রাচীরকে রক্ষা করতে না পারা। কেননা রোম যদি আরও চারশো বছর সাম্রাজ্যকে অটুটই রাখতে পারত, তবে তো আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা আরও চারশো বছর পিছিয়ে যেত এবং হয় তো সে সভ্যতা আর তখন গড়েই উঠতে পারত না! ইতিহাসে তার ওজন কত, সেটা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মাপ নয়।

এই যে চারশো বছর ধরে পৃথিবীর একটা বৃহৎ অংশে বিচিত্র সব জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে এল তার ফলে সৃষ্টি হল কী? মেডিটারেনিয়ন সভ্যতার এই প্রকাণ্ড শূন্যতা, সমস্ত পলিটিক্যাল সভ্যতা–রাজ্য-জয় ও রাজ্য-শাসনের সভ্যতার উপর একটা বিস্তৃত ভাষ্য। বিস্তীর্ণ বাগানের চারপাশে পাথর দিয়ে বেড় দেওয়া হল পাছে আকস্মিক বিপৎপাতে বাগান নষ্ট হয়। পাথরের দেয়াল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, কিন্তু বাগানে ফুলও ফুটিল না, ফলও পাকল না।

৫

রোমান সভ্যতার এই যে উচ্চ জয়গান, এ যে কেবল মিথ্যা স্তুতি তা নয়, এর কলরোল পৃথিবীর প্রবল জাতিগুলির মন চিরদিন বিপথের দিকেই টানবে। যেই যখন শক্তিশালী হয়ে উঠবে তারই মনে হবে মানুষের বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে পৃথিবীর যতটা অংশের উপর পারা যায়, নিজের আধিপত্যের একরঙা তুলিটা বুলিয়ে নেওয়া কেবল স্বার্থ সিদ্ধির উপায় নয়, সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব

লাভেরই পথ। এ যে অতিশয়োক্তি নয়, তার প্রমাণ মমসেন থেকেই তুলে দিচ্ছি। সিজারের গল বিজয়ের বর্ণনা মমসেন এই বলে আরম্ভ করেছেন– ’যেমন মাধ্যাকর্ষণ ও আর আর পাঁচটা প্রাকৃতিক নিয়ম যার অন্যথা হবার জো নেই তেমনি এও একটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, যে জাতি রাষ্ট্র হয়ে গড়ে উঠেছে সে তার অ-রাষ্ট্রবদ্ধ প্রতিবেশী জাতিগুলিকে গ্রাস করবে, এবং সভ্যজাতি, বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন তার প্রতিবেশীদের উচ্ছেদ করবে। এই নিয়মের বলে ইতালি জাতি (প্রাচীন জগতের একমাত্র জাতি যে শ্রেষ্ঠ পলিটিক্যাল উন্নতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা মেশাতে পেরেছিল, যদিও শেষ বস্তুটির বিকাশ তাতে অপূর্ণভাবে এবং কতটা বহিরাবরণের মতোই ছিল) পুবের গ্রিকদের, যাদের ধ্বংসের সময় পূর্ণ হয়ে এসেছিল, তাদের করায়ত্ত করতে, এবং পশ্চিমের কেল্ট জার্মনদের, যাঁরা সভ্যতার সিঁড়ির নীচের ধাপে ছিল, তাদের উচ্ছেদ সাধন করতে সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল।’

প্রাকৃতিক নিয়ম যে কেমন করে অধিকারে পরিণত হয় সে রহস্যের চাবি হয়তো হেগেলের লজিকেও মিলবে না। সে যাই হোক এ নিয়ম’ ও ‘অধিকারের’ মুশকিল। এই যে এর জন্য পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সারাক্ষণ নখদন্ত বের করেই থাকতে হয়। কেননা মল্লাঙ্গনই হচ্ছে এ ‘অধিকার’ প্রমাণের একমাত্র স্থান। কারণ বুকের উপর চেপে বসতে পারলেই প্রমাণ হল যে চেপে বসার অধিকার আছে; আর তাই হল এ অধিকার প্রমাণের একমাত্র শাস্ত্রীয় প্রথা। তারপর শক্তি থাকলেই যখন অধিকার’ আছে, তখন শক্তির পরীক্ষার অধিকার থেকেও কাউকে বঞ্চিত করা চলে না। পরীক্ষা না করলে তো শক্তিটা ঠিক আছে কি না তা আগে থেকে আমনি জানিবার উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত ফেলা হলেও ‘হলে’ ঢোকার অধিকার অস্বীকার করা যায় কেমন করে? গেল চার বছর ধরে এই পরীক্ষাটা সারা ইউরোপ জোড়া চলছে। মমসেনের সৌভাগ্য যে বেঁচে থেকে তার প্রণালীর ফলটা দেখে যেতে হয়নি। কিন্তু প্রাচীন রোমের গুণগানে যাঁরা মুখর, আধুনিক জার্মানির উপর মুখ বঁকানোর তাদের

কোনও অধিকার নেই। কার্থেজ ও মিশর বিজয় যদি রোমের পক্ষে ছিল গৌরবের, তবে বেলজিয়মকে গ্রাস করা জার্মানির পক্ষে আগৌরবের কীসে? আজকাল পলিটিকসে যা হীন, কালকার ইতিহাসে তা মহৎ হয় কোন ন্যায়ের জোরে?

এই যে পলিটিক্যাল শক্তি ও সভ্যতার তুতিগান–এ মূলে হল একটা 'মায়া'। শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন মায়ার প্রকৃতি অধ্যাস', —একের ধর্ম অন্যে আরোপ করা। পৃথিবীর আদিযুগ থেকে যখন জাতিতে জাতিতে লড়াই চলে আসছে আর কোনও 'লিগ অব নেশনে'-ই তা শেষ হবে বলে যখন বোধ হয় না, (কেননা 'লিগের'। একটা অর্থ হচ্ছে এর ভিতরে যাঁরা আসবে না। তাঁরা শত্রু, আর বাইরে যাদের রাখা হবে তাদের এজমালিতে দমন করা চলবে) তখন জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি তার আত্মরক্ষার পক্ষে অমূল্য। জাতির প্রাণই। যদি না বাঁচে তবে তার মনের বিকাশও কাজে কাজেই বন্ধ হয়। কিন্তু এই শক্তি যখন আত্মরক্ষায় নয়-পর-পীড়নেই রত থাকে, রক্ষার চেষ্টায় নয়–ধ্বংসের লীলাতেই মেতে ওঠে তখনও যে তার পূজা, তার মূলে হল অধ্যাস'। একের গুণ আর একজনে দেখা, রামের পাওনা শ্যামকে বুঝিয়ে দেওয়া। অবিশ্যি এ দুয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট। কিন্তু একান্ত 'অবিষয় হলে তো 'অধ্যাসেরও উৎপত্তি হয় না।

আশ্বিন ১৩২৫

আর্যামি

আমাদের আদিম আর্য প্রপিতামহেরা ধরা পৃষ্ঠের ঠিক কোন জায়গা থেকে যাত্রারম্ভ করে যে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছেন, সে প্রশ্নের একটি নিশ্চিত জবাব দেওয়া শক্ত। তাঁরা কি মধ্য-এশিয়ার পশ্চিম দিকটায় ভেড়া চরাতেন, না নরওয়ের উত্তর-মাথায় মাছ শিকার করতেন, এ তর্কের কোনও মীমাংসা হয়নি। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে যে যব তাঁরা সকলে মিলে নিঃসন্দেহই খেতেন, তা তাদের চাষ করে-পাওয়া, না ইউফ্রেটিসের তীরের বুনো যাব, সে বিষয়েও মহা মতভেদ রয়েছে। তারপর তাদের সবারই মাথার প্রস্থের একশো গুণকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যে কখনওই পাঁচাত্তরের বেশি হত না, একথা আর এখন কোনও পণ্ডিতই হলপ করে বলতে রাজি নন। বরং শোনা যাচ্ছে যে, যেমন আমাদের বাঙালি ব্রাহ্মণেরা সবাই এক আর্যবংশাবতংস হলেও তাদের চেহারায় এ-মিলটা ধরার জো নেই, কেননা কেউ কটা কেউ কৃষ্ণ, কারও মাথা গোল কারও চেপটা, তেমনি আদিম আর্যদের মধ্যেও চেহারার এই গরমিলের দিকেই প্রমাণের পাল্লাটা নাকি বেশি ভারী হয়ে দাড়াচ্ছে। এমনকী একদল কালাপাহাড়ি পণ্ডিত এরই মধ্যে বলতে শুরু করেছেন যে, আর্য বলে কোনও একটা বিশিষ্ট জাত, অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট জাত যাকে ওই এক নামে ডাকার কোনও বস্তুগত কারণ আছে, কোনওদিনই কোনওখানে ছিলনা। ওটা একটা ভাষাতত্ব ও নৃতত্ত্বের পণ্ডিতদের মানসিক সৃষ্টি, 'ওয়ার্কিং হাইপথিসিস'।

যেমন গতিক দেখা যাচ্ছে, তাতে করে প্রাচীন ও আদিম আর্যজাতির অদৃদেষ্ট কী আছে বলা কঠিন। আসছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁরা বিধাতার সৃষ্টি বলে কায়েম হয়েও বসতে পারেন, আবার মানুষের কল্পনা বলে বাস্তব পদার্থের লিস্টি থেকে তাঁদের নামও কাটা যেতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। আর্যজাতির কপালে যা-ই ঘটুক, তাঁরা বস্তু হয়ে চেপেই বসুন, আর অবস্তু হয়ে উড়েই যান, 'আর্যামি' বস্তুটির তাতে বিশেষ কোনও

ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। যাঁরা মনে করে, কারণ না থাকলেই আর তার কার্য থাকে না, তাঁরা না পড়েছে দর্শনশাস্ত্র, না আছে তাদের লৌকিক জ্ঞান। 'নিমিত্ত' কারণ যে একটা কারণ, একথা আরিস্টটল থেকে অন্নভট্ট পর্যন্ত সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এবং ও-কারণটি নিজে ধ্বংস হলেও তার কার্য ধ্বংস হয় না। যেমন নিজের বোনা কাপড়খানির পূর্বেই তাতি বেচারির জীবনান্ত ঘটতে কিছুই আটক নেই। আর পুথি ছেড়ে সংসারের দিকে চেয়ে দেখলেও এর ভুরি ভুরি প্রমাণ চোখে পড়বে। যুদ্ধ থেমে গেছে কিন্তু 'পাবলিসিটি বোর্ড' চলছে; জার্মানভীতি ঘুচে গেল অথচ 'রিফর্ম স্কিম' নিয়ে আমাদের তর্ক শেষ হয়নি; এমনকী বিলাতের কলের মজুরেরা যেমন যুদ্ধের মধ্যে দুবেলা পেটপুরে খেয়েছে, যুদ্ধের পরেও তেমনি চলুক বলে হাঙ্গাম উপস্থিত করেছে।

কিন্তু প্রকৃত গোড়ার কথা এই যে, 'আর্যামি'র সঙ্গে 'আর্যের' আসলে কোনও কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। আর্যজাতি পৃথিবীতে যতই প্রাচীন হন না কেন, 'আর্যামি' জিনিসটি যে মনুষ্য সমাজে তার চেয়ে ঢের বেশি প্রাচীন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না। বুৎপত্তি দিয়ে বস্তুনির্ণয়ের চেষ্টা করে শুধু এক বৈয়াকরণ; এবং ও-জাতটি যে কাণ্ডজ্ঞানহীন একথা সর্ববাদিসম্মত। 'আর্যামি' হল মানুষের সেই মনোবৃত্তির প্রকাশ ও বিকাশ, বিলাতি পণ্ডিতদের মতে যাতে ইত্যর প্রাণী থেকে মানুষ তফাত, অর্থাৎ তার 'সেলফ কনশাসনেস'; আর দেশিতত্ত্বজ্ঞদের মতে যার সম্পূর্ণ বিনাশ, অথবা যা একই কথা–চরম বিকাশই হচ্ছে পরামুক্তির পথ, অর্থাৎ অহংজ্ঞান। সমাজতত্ত্ববেত্তারা বলেন, মানুষ যে পরের মধ্যে নিজের সাদৃশ্য দেখে, তাতেই সে অপরের সঙ্গে সমাজ বেঁধে ঘর করতে পারে। এই সাদৃশ্যবোধ হল সমাজবন্ধনের একটা পোক্ত শিকল। কিন্তু সবাই জানে ভিন্ন জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্যজ্ঞানটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। সূক্ষ্মবুদ্ধির কাজ হচ্ছে একইরকম জিনিসের মধ্যে থেকে তফাত বের করা। সুতরাং মানুষ যখন সূক্ষ্মবুদ্ধির

জোরেই করে থাচ্ছে, তখন তার বুদ্ধির স্বাভাবিক বেঁধাকটা হল পরের সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য নিয়ে খুশি না থেকে, এই মিলের মধ্যে অমিল কোন কোন জায়গায় তাই খুঁজে বের করার দিকে। আর এ খোঁজে কাকেও ব্যর্থ হতে হয় না। কেননা একে তো লাইবনিজ প্রমাণই করে গেছেন যে, সংসারে দুটি বস্তুর ঠিক একরকম হবার কোনও জো-ই নেই; আর লাইবনিজ ছিলেন একজন দিগগজ গণিতজ্ঞ লোক। তারপর সবাই নিজেকে জানে সাক্ষাৎভাবে, অন্য সকলকে পরোক্ষে। আমার বুদ্ধি আমার কাছে স্বপ্রকাশ, অন্যের বুদ্ধি আছে কি নেই, সেটা অনুমানের কথা। কাজেই আমি যে অন্য সকলের চেয়েই ভিন্নরকমের, এবং মোটের উপর এ-রকমটি আর হয় না, এ জ্ঞান যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। নিজের সম্বন্ধে এই মর্মগত বোধটা লোকে যখন প্রকাশ করে ফেলে, তখন তার নাম হয় ‘অহংকার’, দ্বিতীয় ভাগ থেকে বেদান্তগ্রন্থ পর্যন্ত সবাই যার একটানা নিন্দা করেন। আর এ ভাবটি যখন একটা দলকে ধরে প্রকাশ হয়, তখন সেই বস্তুটিই হল ‘আর্যামি’। কেবল দলের প্রকারভেদে নামের রকমভেদ ঘটে, যেমন আভিজাত্য, ব্রাহ্মণত্ব, পেট্রিয়টিজম, অ্যাংলো-স্যাকসনত্ব ইত্যাদি। এবং ভাট, চারণ, কবি, ঐতিহাসিক সকলে মিলে মানুষের সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এর জায়গান গেয়ে আসছে।

সংসারে এমন সব সরলবুদ্ধির লোকও আছে যাঁরা প্রশ্ন করে বসে ব্যক্তির পক্ষে যেটা দোষের, সমাজ বা জাতি, অর্থাৎ ব্যক্তিসমষ্টির পক্ষে সেইটিরই বর্ধিত সংস্করণ বা ‘এনলার্জড এডিশন’ কোন প্রশংসার?—-অবশ্য এর সোজা উত্তর এই যে, ব্যক্তি আর জাতি এক নয়, কেননা যদি তা হত, তা হলে ও-দুয়ের নাম এক না হয়ে, ভিন্ন ভিন্ন হবে কেন! উক্তরূপ প্রশ্নকর্তাদের পাণ্ডিত্যের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা নেই; না হলে জার্মন, অ-জার্মন সবরকম পণ্ডিতের প্রাচীন নূতন নানা মত তুলে এ-ও দেখানো যেত যে, জাতি বা ‘স্টেট’ জিনিসটা মোটেই ব্যক্তির সমষ্টি নয়। কেননা ও-নিজেই একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যার একটা

নিজস্ব গুণ, ইচ্ছা, অনুভূতি আছে, যা জাতি বা স্টেটের লোকদের গুণ, ইচ্ছা ও অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র, মোটেই তার সমষ্টি নয়। অর্থাৎ দেশের সব লোক দরিদ্র হলেও দেশটা ধনী হতে কোনও আটক নেই। আর এ-কথা যে ঠিক, ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোককেই তা স্বীকার করতে হবে। এইসব সূক্ষ্মী অথচ প্রকাণ্ড তত্ত্ব যাদের বুদ্ধির অগম্য তাদের জন্য একটা সহজ ছোট উত্তর দেওয়া যাচ্ছে। কারু নিজের সম্বন্ধে অহংকার প্রকাশ করাটা যে, সমাজে নিন্দার কথা, তার কারণ ওই এক অহং-এর খোঁচা আর সকল অহং-এর গায়ে লেগে তাদের ব্যথিত করে তোলে। কিন্তু একটা গোটা দলকে ধরে যখন এটি প্রকাশ হয়, তখন দোষটা আর থাকে না। এবং এতে দলের সকলেরই সহানুভূতি পাওয়া যায়। অবশ্য একদলের অহংবোধটা অন্য আর একদলের গায়ে লাগেই লাগে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কেননা আমাদের যা কিছু রীতি, নীতি, বিধি, নিষেধ, সে সবই হল ছোট হোক বড় হোক কোনও একটা দলের লোকদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারকে লক্ষ্য করে। একদলের সঙ্গে আর একদলের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা এ-সব কোনও কিছুরই লক্ষ্য নয়! সেইজন্য লোকের সঙ্গে কথায় ও কাজে যে লোকের ভদ্রতার সীমা নেই, সেই লোকই একটা সমস্ত জাতির সম্বন্ধে কথায় বা ব্যবহারে কোনওরকম ভদ্রত রক্ষার প্রয়োজন বোধ করে না। যে লোক জীবনে কাকেও কোনওদিন কড়া কথা বলেনি, সেও দল বেঁধে একটা গোটা দেশকে পোষণে ও শোষণে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

আধুনিক ইউরোপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ‘ইন্টারন্যাশানাল ল’ বলে যে আপসি ব্যবহারনীতির চলতি আছে, সকলেই জানে যে, তার গোড়ার কথা হচ্ছে সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের যে-সব নিয়মকানুন গড়ে উঠেছে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ব্যবহারে সেইগুলিকে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। ডাচ পণ্ডিত হুগো গ্রোসিয়াসকে এই আন্তর্জাতিক ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক বলা চলে।

এ সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র আলোচনা করেছেন তিনিই জানেন যে, রোমান ব্যবহারশাস্ত্রে লোক-ব্যবহারের যে নিয়মগুলি সর্বসাধারণ, সুতরাং স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়েছিল, গ্রোসিয়াস সেইগুলিকেই তাঁর মৈত্রীবিগ্রহ সংহিতার ভিত্তি করেছিলেন। ব্যক্তির নীতিকে সমষ্টির রীতি করে তোলার এই চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে, ১৯১৪ সালে তার একটা পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, এবং ১৯১৮ সালেই তার শেষ হয়েছে এমন মনে করবার কোনও সংগত কারণ নেই।

একটা অবাস্তর কথা দিয়ে 'আর্যামির এই উৎপত্তি পর্বের অধ্যায় শেষ করা যাক। ইংরেজ-দার্শনিক হবস গ্রোসিয়াসেরই সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন যে, আদিতে মনুষ্য-সমাজ রাষ্ট্রবদ্ধ ছিল না। এবং কাজেই পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মও চলতি ছিল না। সে ছিল একটা নিত্য বিগ্রহ বিবাদের যুগ, যখন প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু, এবং সবারই হাত তখন সবারই বিরুদ্ধে তোলা থাকত। এই ভয়ানক দুরবস্থাটা মোচন করবার জন্যই সবাই মিলে একটা 'স্টেট' গড়ে তার হাতে আত্মসমর্পণ করেছে, এবং 'স্টেট' পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের আইন-কানুন বেঁধে দিয়ে বৈষম্যের জায়গায় শান্তি এনেছে। বহু পণ্ডিত প্রমাণ করেছেন এবং এখনও করছেন যে, হবসের এই কল্পনাটা একেবারে অনৈতিহাসিক। মানুষ কোনওদিনই সমাজ ছাড়া ছিল না, এবং কোনও রাষ্ট্র-গড়ার মজলিসের প্রসিডিং, কি পাথরে কি তামায়, এ পর্যন্ত কোনও পুরাতত্ত্ববিদই আবিষ্কার করতে পারেননি। কিন্তু একটা সন্দেহ মনে না এসে যায় না। মানুষের আদিম অবস্থার এই যে কল্পনাটা সেটা হবস নিয়েছিলেন তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজ্যগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ থেকে। অর্থাৎ গ্রোসিয়াস চেয়েছিলেন, লোক-ব্যবহারের নীতি নিয়ে এই সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করতে, আর হবস কল্পনা করেছিলেন, এই নীতি নিয়ম প্রচলনের পূর্বে লোকের সঙ্গে লোকের সম্বন্ধ ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধেরই মতো। পাঠককে মনে

করিয়ে দিচ্ছি যে গ্রোসিয়াসের বিখ্যাত পুথির ছাব্বিশ বছর পরে হবসের ‘লিভিয়াথন’ প্রকাশিত হয়।

২

আর্যামির জন্ম রহস্যটা একবার প্রকাশ হলে তার জীবন-চরিত্যের হেরফেরগুলো বুঝতে আর কষ্ট হয় না।

বড় হোক, ছোট হোক একটা দলের নাম দিয়ে নাকি এ জিনিসটিকে চালাতে হয়, তাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে অল্প-বিস্তর মোটারকম বাহ্যিক লক্ষণের উপরেই দাড় করানো ছাড়া উপায় থাকে না। গায়ের চামড়ার রং, মাথার খুলির মাপ, সাগরবিশেষের পশ্চিম পারে কি পর্বতবিশেষের উত্তর ধারে নিবাস স্থান, খাবার জিনিসে নাইট্রোজেনের প্রাচুর্য কি স্নেহ-পদার্থের আধিক্য, পূর্বপুরুষ ঘোড়ায় চড়ে বর্শা চালাতেন কি মাটিতে দাঁড়িয়ে তির ছুড়তেন, এইরকম যাহোক কিছু একটার উপরেই একটা প্রকাণ্ড অভিমানের ইমারত গড়ে তুলতে হয়। অবশ্য এই চর্মাস্থি-বিদ্যা, ভৌগোলিক-তথ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার এর প্রত্যেকটিরই ‘ইনুয়েন্ডো’ বা ইঙ্গিত হচ্ছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির এক একটি লম্বা ফর্দ। এ-সব লক্ষণের সঙ্গে এ-সব গুণের কোনওরকম অন্যথা সিদ্ধিশূন্য’ বা নিত্যসম্বন্ধ আছে কি না সে সন্দেহে আর্যামির অভিমানকে কখনও সংকুচিত হতে হয় না। কেননা লক্ষণগুলি হল বাহ্যিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, আর গুণগুলি হল নিগূঢ় অর্থাৎ আনুমানিক। প্রত্যক্ষ নিয়ে তর্ক চলে না, আর তর্কের ভূমিই হল অনুমান। এবং তর্ক জিনিসটার সুবিধা এই যে, এ ব্যাপারে পরাজয় নির্ভর করে বিপক্ষের শক্তির উপর নয়, নিজের ইচ্ছার উপরে। নিজে

স্বীকার না। করলে তর্কে হার হয়েছে, এ অবশ্য কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। কেননা সেইটিই হবে আবার একটা তর্কের বিষয়।

ব্যক্তির অহংকারের চেয়ে সমষ্টির অহংকারের একটা শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এক এক যা নিয়ে কোনওরকমেই অহংকার করা চলে না, দল বেঁধে তাকেই একটা দুর্জয় অহংকারের কারণ করে তোলা যায়। এক যুগের ফরাসিরা সে যুগের ইংরেজদের বুদ্ধিসুদ্ধিতে বিশেষ মুগ্ধ না হয়ে, তাদের নাম দিয়েছিল 'জনবুল'। আজ ইংল্যান্ডের খবরের কাগজ লেখকেরা এই নামটাকেই একটা উৎকট জাতীয়-অভিমান প্রকাশের রাস্ত করে তুলেছে। এ-জাতির বুদ্ধি যে একটু মোটা বলে বোধ হয়, তার কারণ এ-বুদ্ধি হালকা নয়, গুরুতর রকমের ভারী; এতে যে বেশি ঢেউ খেলে না, এর অতলস্পর্শ গভীরতাই হল তার কারণ: এ জাত যে চট করে একটা 'থিয়োরি' কি 'আইডিয়েল' নিয়ে মেতে ওঠে না তার কারণ এদের স্থির 'প্র্যাকটিক্যাল' বুদ্ধি; ফরাসির মতো এদের সাম্য ও স্বাধীনতা এক দিনে কুড়িয়ে পাওয়া নয়, কারণ নজিরের পর নজির ধরে ক্রমশ এর আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে, সেইজন্য গতিটা একটু মন্থর। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, 'জনবুলত্বের' এত গুণব্যাখ্যান সত্বেও কোনও ইংরেজ এটা স্বীকার করতে রাজি হবে কি না, তার নিজের বুদ্ধিটা আপাতদৃষ্টিতেও একটু মোটা, যতই গুরুত্ব এবং গভীরতা সে দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ হোক না কেন। অর্থাৎ 'জনবুলত্বের' উপর জাতীয়-অভিমান অনায়াসে দাড় করানো যায়, কিন্তু কোনও ব্যক্তির পক্ষে ওটাকে নিয়ে অহংকার দেখানো একটু শক্ত। বোধহয় ঠিক এই কারণেই আমাদের জাতীয়-চরিত্রের দুর্বলতাগুলিকে লজ্জা দিয়ে বিদায় করবার জন্য প্রবন্ধে, গানে, বক্তৃতায় যে-সব চেষ্টা হয়েছে, তাতে তেমন আশানুরূপ ফল দেখা যায় নাই। কেননা লজ্জা জিনিসটা মানুষে পায় কোনও কারণে দল থেকে তফাত হয়ে পড়তে হলে। সুতরাং সবাই মিলে দল বেঁধে লজ্জা পাওয়াটা বড় একটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বরং জাতীয়-

জীবনের অবস্থা দেখে সবাই মিলে যে লজ্জা পাওয়ার চেষ্টা করছি এই ব্যাপারটিকেই একটা অহংকারের কারণ করে তোলা কিছুই কঠিন নয়।

৩

‘আর্যামি’ যত রকমের আছে, বলা বাহুল্য, তার মধ্যে সেরা হচ্ছে জন্মগত ‘আর্যামি’। এর কারণও খুব স্পষ্ট। জন্মকে ভিত করে ‘আর্যামীর অহংকার দাড় করানো যেমন সহজ, এর শ্রেষ্ঠত্বের স্পর্ধাটাও হয় তেমনি গগনস্পর্শী। জন্মের উপর যে জীবের গুণাগুণ নির্ভর করে তা ঘোড়ার বংশে যখন ঘোড়া আর গোরুর বংশে গোরুই জন্মাচ্ছে তখন অস্বীকার করবার জো নেই। আর ভেদটা কেবল পৃথক-জাতীয় ভেদ নয়, স্বজাতীয় ভেদও বটে। সে কথা নবীন লেখক হাউস্টন চেম্বারলেইন ও প্রাচীন ঋষি বশিষ্ঠ(১) দুজনেই তেজি ঘোড়ার উচু বংশের দৃষ্টান্তে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং জন্মের উপর শ্রেষ্ঠতার দাবিকে ভিত্তিহীন বলে সরাসরি অগ্রাহ্য করা চলে না, এবং এ দাবি উপস্থিত করতেও এক জন্মানো ছাড়া আর কিছুই অপরিহার্য নয়। কোনও বিশেষ বংশের সঙ্গে বিশেষ গুণের যোগাযোগ আছে কি না। সে তর্ক তোলা যায় বটে, কিন্তু এর মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা না থাকাতে কারও কোনও ভয়ের কারণ নেই। বর্তমান বংশধরদের মধ্যে গুণটানা থাকলেই যে সে গুণ বংশে নেই এটা একেবারেই প্রমাণ হয় না। কেননা বর্তমানে হয়তো। ওটা ‘লেটেন্ট’ ভাবে রয়েছে, ভবিষ্যবংশীয়দের মধ্যে ঠিক ফুটে বেরোবে! ‘অ্যাটেভিজম’ যে একটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার তার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত তো ডারউইনের পুথিতেই রয়েছে! ‘জার্‌ম প্ল্যাস্‌ম্‌ জিনিসটি যে অমর, সে তথ্য বাইস-ম্যানই প্রমাণ করে গেছেন।

আর এই সহজ দাবিটির বহরই বা কী বিরাট। এ যে শ্রেষ্ঠত্ব, এ মিশে রয়েছে একেবারে রক্তের সঙ্গে, তৈজস-নাড়ির অণুতে অণুতে। যার সঙ্গে সে রক্তের সম্পর্ক নেই, সে সারা জীবন তপস্যাতেও এর কাছে ঘেঁষতে পারবে না। অথচ এই দুর্লভ মহত্ব যাঁরা পেয়েছে তাঁরা পেয়েছে একবারে বিনা আয়াসে; মিতাক্ষরা বংশের ছেলের মতো কেবলমাত্র জন্মের জোরে ও জন্মের সঙ্গে। একে লাভ করতেও যেমন আয়াস নেই, বজায় রাখতেও তেমনি কষ্ট নেই। কেননা এ শ্রেষ্ঠত্বকে ঝেড়েও ফেলা যায় না, এর নষ্ট হবারও ভয় নেই। সহজ কথায় জন্মগত আর্যামিটি হচ্ছে দল বেঁধে প্রতিভা ও আরও কিছু উপরির দাবি। কেননা প্রতিভারও উত্তরাধিকার নেই।

এ-কথা বোধহয় আর না বললেও চলে যে, মিত্তির বংশের গৌরব ও নয়নজোড়ের বাবুয়ানা থেকে আরম্ভ করে কুলীনত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, দ্বিজত্ব, শ্বেতচর্মত্ব এবং অবশেষে আর্যত্ব পর্যন্ত সবই হল জন্মগত আর্যামিরই প্রকারভেদ। এর প্রতিটিই একটা-না-একটা আস্ত দলের পক্ষে অসাধারণত্বের দাবি। অবশ্য কোনও দল ছোট, কোনওটি মাঝারি, কোনওটি অতি প্রকাণ্ড। কিন্তু সর্বত্রই দলের লোকদের পরস্পর সম্বন্ধ হচ্ছে সপিণ্ড সম্বন্ধ, হয় বস্তুগত্যা, নয় কল্পিত। তবে এ সপিণ্ডত্বের সাত পুরুষে নিবৃত্তি হয় না। দরকার হলে একে ব্রহ্মার মুখ পর্যন্ত, কি আদি আর্যভূমির আদিম আর্য-দম্পতি পর্যন্ত অনায়াসে টেনে নেওয়া চলে। এবং যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা বোধহয় এর একটাকে আর একটার চেয়ে বড় বেশি অপ্রামাণ্য বলতে সাহসী হবেন না।

জন্মগত আর্যামি এ পর্যন্ত যত রকমের দল ধরে প্রকাশ হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দল হল আর্যত্বের দল। আর্যামি ও আর্যত্ব দুটি যে এক জিনিস নয়, দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই প্রকারবিশেষ মাত্র, এতক্ষণের আলোচনায় এই কথাটি নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে; সুতরাং এর পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই 'আর্যামি' বিশেষের দু-একটি বিশেষত্বের আলোচনা না করলেই নয়। কেননা আর্যামির এই বিরাট প্রকাশটিকে একবার ধারণা করতে পারলেই আর্যামির স্বরূপ বুঝতে আর কিছু বাকি থাকবে না।

এই আর্যামির ছোটখাটো দাবিটি কতকটা এইরকমের— পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর থেকে যতসব জাতির আবির্ভাব হয়েছে, আর্যজাতি যে তাদের মধ্যে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ তা নয়, তার শ্রেষ্ঠত্ব একবারে অতুলনীয়। আর্যেতর কোনও জাতির সঙ্গে শরীরে কি মনে তার কোনও তুলনাই চলে না। আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত মানব-সভ্যতার যা কিছু সৃষ্টি তা সবই হয়েছে আর্যজাতির কোনও-না-কোনও শাখার হাত দিয়ে। অন্য সব জাতির সামান্য যা দান, তা সফল ও সার্থক হয়েছে, কেবল আর্য-মহারাজ তা গ্রহণ করে নিজস্ব করেছেন বলে। এ জাতির যা আচার, ব্যবহার, ধর্ম, সমাজ তাই হল সদাচার, সধর্ম, শিষ্ট সমাজ, আর এর বাইরে সবই অনার্য' ও 'বারবারিকা'। সুতরাং পৃথিবীর আধিপত্যে আর্যজাতির যে দাবি সে খাঁটি ন্যায়ের দাবি। গ্রিক-আর্য আরিস্টটল বলেছেন যে হঠাৎ যদি পৃথিবীতে একদল লোকের আবির্ভাব হয়, যাঁরা কেবল শরীরের আয়তনে ও গড়নে দেবতাদের মতো আর সব মানুষের চেয়ে তফাত ও শ্রেষ্ঠ তবে সবাই নির্বিবাদে স্বীকার করবে যে, আর সমস্ত লোকের উপর তাদের আধিপত্যের ধর্ম ও ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে। এবং যদি কেবল সামান্য দেহের সম্বন্ধেই এ কথা ঠিক হয়, তবে মনে যাঁরা অসাধারণ সাধারণ লোকের উপর তাদের আধিপত্যের অধিকারটা কত বেশি! এই কথাটাই খুব অল্পের মধ্যে প্রকাশ করে তিনি বলেছেন যে, 'এক

জাতির লোক স্বভাবতই স্বাধীন, আর এক জাতির লোকের স্বভাবই দাসত্ব।' এই হচ্ছে সার সত্য। কেননা স্বাধীনতা জিনিসটা মনুষ্যত্বের সামান্য ধর্ম নয় যে সব মানুষেরই তাতে কোনও অধিকার আছে; কারণ এ তো খুব স্পষ্ট যে, সে অধিকার নির্ভর করে স্বাধীনতার মূল্যোপলব্ধির ক্ষমতার উপর, যার ভিত্তি হল দেহের ও মনের শক্তি। এ কথা খুব নির্ভয়েই বলা চলে যে, অনেক জাতির লোক রয়েছে স্বাধীনতার কল্পনাও যাদের অজ্ঞাত। সেইজন্য দাসত্ব কি প্রভুত্ব দুই অবস্থাই তাদের সমান। যতটুকু উন্নতি তাদের সম্ভব, অবস্থাভেদে তার কোনও প্রভেদ ঘটে না। ইহুদি, চিনা, সেমিটিক ও অর্ধসেমিটিক জাতিগুলি এর দৃষ্টান্ত।

উপরের বর্ণনায় আর্যজাতির আধিপত্য-দাবির অংশটা, অর্থাৎ এ ন্যায়ের প্রতিজ্ঞাটি, প্রসিদ্ধ লেখক হাউস্টন চেম্বারলেইনের 'উনবিংশ শতাব্দীর ভিত্তি' নামক অপূর্ব গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে দিয়েছি। চেম্বারলেইন জাতিতে ইংরেজ, শিক্ষায় জার্মান; এবং তাঁর পুথি রচনা করেছেন জার্মানভাষায়। যাঁরা চেম্বারলেইন-এর মতামতের খুব সদয় সমালোচক নন তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে, তার হাতের কলম হল সোনার কাঠি। বস্তুত সে কলম যে সলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিচিত্র ইতিহাসের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, তাতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। তাঁর গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠা থেকে যে রসজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ, শ্রদ্ধা ও ঘৃণা, অনুরাগ ও বিদ্বেষের তীব্র আলো ঠিকরে পড়ছে তাতে অল্প-বিস্তর চোখ না। ঝলসে যায় না। কিন্তু আর্যজাতির পক্ষে এই যে সর্বাধিপত্যের দাবি, যা র্তার পুথিতে গোঁড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, বারবার উপস্থিত করা হয়েছে, এর কদর্যতা ও ভীষণতা চেম্বারলেইন-এর কলমের কালিতেও একটুকুও ঢাকা পড়েনি।

কেননা এর পাণ্ডিত্যের পোশাক আর যুক্তির মুখোশ খুলে ফেললে যা বেরিয়ে পড়ে, সে হচ্ছে আদিম নগ্ন বর্বরতা, যা নিজের দলের বাইরে কাকেও শত্রু ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারে না। এবং হয় মৃত্যু নয় দাসত্ব এ ছাড়া সে শত্রুতার আর কোনও অবসানও কল্পনা করতে পারে না। হয়তো মানুষের ইতিহাসে এমন এক দিন ছিল যখন সমস্ত জাতি মানুষের দল, কি আর্য কি অনার্য, এই মনোভাব নিয়েই প্রতিবেশী অন্য সব দলের সঙ্গে কারবার করত। এবং এও সম্ভব যে এই নির্মম বিরোধের উষ্ণ রক্তের স্পর্শেই মানুষের সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটেছে, তার সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যবহারে প্রাণ ও গতিসঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মানুষের এই যে আদিম ভয় ও বিদ্বেষ, লোভ ও নিষ্ঠুরতা, এ হল প্রকৃতির অদম্য ও অন্ধ শক্তিরই রূপান্তর। এ তর্ক করে না, যুক্তি দেয় না, ন্যায়ের দোহাই পাড়ে না, সুন্দরবনের বাঘের মতো শিকার দেখলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। দামোদরের বন্যার ধ্বংসলীলার মতো ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণে এরও কোনও বিচার চলে না। কিন্তু যখনই তর্ক করে, যুক্তি দিয়ে, ন্যায়-ধর্মের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে জাতির উপর জাতির আধিপত্যকে, দলের সঙ্গে দলের শত্রুতাকে খাড়া রাখতে হয় তখনই বুঝতে হবে যে, সে জাতি প্রকৃতির গোড়ার ধাপ ছাড়িয়ে উঠেছে। কারণ সে জাতির কাছে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয়েছে যে জাতির সঙ্গে জাতির, দলের সঙ্গে দলের এক শত্রুতার সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ সম্ভব, এবং সেই সম্বন্ধই নিত্য ও ঘনিষ্ঠ। এ ধাপে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির ধর্মকেই ধর্মের বিচারে আশ্রয় করলে ধর্মও এখন তাকে বিচার করবে। প্রস্তাবনা ও প্রথম অঙ্ককে সমস্ত নাটকের ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টানতে চেষ্টা করলে কাব্যের সৌন্দর্য তাতে কেবল আঘাতই পাবে।

মানুষের সভ্যতায় আর্যজাতির দান অনেক, হয়তো অপূর্ব ও অতুলনীয়। কিন্তু মানুষের উপর তার আর্যামির আঘাতও কম প্রচণ্ড নয়। আর্য-রোম অনার্য-কার্থেজকে একবারে ধুলা না করে তৃপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ অন্য একটা সভ্যতাকে একবারে ধ্বংস না করে নিজের সভ্যতাকে বজায় রাখবার কোনও

পথ সে খুঁজে পায়নি। যে হিন্দু আর্য ওষধি ও বনস্পতিতে বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি করেছে, ‘দসুয’ ও ‘রাক্ষসের প্রাণের উপর সেও কোনও মায়া দেখায়নি। আধুনিক ইউরোপীয় আর্য দুটি মহাদেশ থেকে সেখানকার অনার্য অধিবাসীদের একেবারে মুছে ফেলেছে, এবং আর একটা মহাদেশ থেকেও মুছে ফেলবার চেষ্টায় আছে। এ চেষ্টার সমর্থনে যুক্তির অবশ্য অভাব নেই। এই উচ্ছেদ ও ধ্বংস না হলে যে আধুনিক আর্য-সভ্যতার যে গৌরব, তারও বিকাশই হতে পারত না। এই গরীয়সী সভ্যতাকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়াই হল ধর্ম। এবং যাদের রক্তের মধ্যে এই সভ্যতা রয়েছে তাদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া ছাড়া এর অন্য কোনও উপায় নেই। তাতে যদি অন্য সব জাতিকে পৃথিবী ছেড়ে গিয়েও এর জায়গা করে দিতে হয় মানবজাতির পক্ষে সেও মঙ্গল। লক্ষ্মণের কাছে অগস্ত্য-ঋষির পরিচয় দিতে রামচন্দ্র তীকে ‘পুণ্যকর্মা’ বলে উল্লেখ করেছেন, কেননা তার ত্রাসে দক্ষিণ দিকে ‘রাক্ষসেরা পা বাড়াতে সাহস না করায় সে দিকটা ‘লোকদের’ বাসের উপযুক্ত হয়েছে। এবং এ যুক্তির উত্তর দেওয়াও কঠিন। কেননা যা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে যা ঘটেনি। তাকে ওজনে তোলা চলে না। বর্তমান আর্য-সভ্যতা না গড়ে উঠলে আর্য অনার্য মিশাল সভ্যতা কীরকমের হত, কি তেমন কোনও সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারত কি না। এ তর্ক এখন তোলা একবারেই নিস্ফল, কারণ এর কোনওরকম মীমাংসার সুদূর সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের উপর আধিপত্য ও উচ্ছেদের দাবিটাও যে কত অচল, মানুষের সভ্যতার গোটা ইতিহাসটাই তার প্রমাণ। এ দাবির গোড়ার কল্পনা হল এই যে, যে জাতি একবার বড় হয়ে উঠেছে সে চিরকালই বড় থাকবে, এবং আর কেউ বড় হয়ে উঠতে পারবে না। অথচ যেসব জাতির পর জাতি এতকাল ধরে মানুষের সভ্যতাকে কখনও ধীরে কখনও দ্রুত গড়ে তুলেছে তাদের কেউ কারও বংশধর নয়। আজই কি হঠাৎ মানুষের সভ্যতায় এই ধ্বংস ও সৃষ্টি লীলা থেমে গেল!! অথচ চিরকালই তো যে মাথায় উঠেছে সেই মনে করেছে সে একেবারে অচ্যুত। এবং পূর্ব পূর্ব শ্রেষ্ঠ জাতির পতন হলেও তার যে কেন সেটা

ঘটবে না। তার কারণ খুঁজে বের করতে কারও কখনও কষ্ট হয়নি। প্রতিদিন জীব যম-মন্দিরে যাচ্ছে দেখেও অমরত্বের কল্পনা আশ্চর্য সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও বেশি আশ্চর্য এই কল্পনা যে, যাঁরা বেঁচে আছে তাঁরা যে কেবল অমর হবে তা নয়, আর নতুন কারও জন্মও হবে না।

৫

আর্যত্বের 'আর্যামি' এতক্ষণ যা বর্ণনা করেছি। সে হল তার একটা মাত্র দিক। কেননা ব্রহ্মের যেমন দুইরূপ, এ আর্যামিরও তেমনি দুই মূর্তি; সগুণ ও নির্গুণ, ক্রিয়াশীল ও নিস্ক্রিয়। বলা বাহুল্য যে, বর্তমানে এর প্রথমটির বিকাশ হয়েছে ইউরোপের আর্য-সমাজে, দ্বিতীয়টির পূর্ণ-প্রকাশ আর্যভূমি ভারতবর্ষে। পশ্চিম শাখাটি দাবি করছে সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বেশ্বরত্ব; তার ক্রিয়ার দাপটে আর সকলের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া একরকম রুদ্ধ। আর পুবের শাখাটি 'নিষ্কলং নিস্ক্রিয়ং শান্তং', 'অপ্রাণ' ও 'আমন'। সকলেই জানে যে সগুণত্বের সিঁড়ি দিয়েই নির্তৃণত্বে পৌছিতে হয়। ভারতীয় আর্যেরাও অবশ্য তাই করেছেন। ক্রিয়াশীলত্বের সিঁড়ি দিয়ে নিস্ক্রিয়ত্বের ছাদে এসে পৌছেছেন। এটা যে পরমার্থের অবস্থা তাতে সন্দেহ নেই, কেননা 'একরূপে অবস্থিত যে অর্থ' তাই হল পরমার্থ। যাঁরা এ অবস্থা থেকে ভারতের আর্য-সমাজকে আবার সচল অবস্থায় নিতে চান তাঁরা ইভলিউশনের'' গতিবিধির কোনও খবরই রাখেন না।

যাহোক, আর্যামির এই সগুণ ও নির্গুণ প্রকাশের মধ্যে একটি আন্তরিক মিল রয়েছে, কেননা এ দুই হলেও মূলে এক। সে মিলটি হচ্ছে যে, দুয়ের পথই বিবেকানন্দ যাকে বলেছেন ছুৎমার্গ, বাইরের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে নিজের

শুচিত রক্ষা করা। তবে পশ্চিমের ওদের পথ হল আর সবাইকে তাড়ানো, আমাদের কৌশল হল সবার কাছ থেকে পালান। শেষ পর্যন্ত কোনটায় বেশি ফল হয় বলা কঠিন।

মানুষে মানুষে চরিত্র ও মনের শক্তির যে তফাত, জাতির সঙ্গে জাতির সে তফাতের চেষ্টার কোনও অর্থ আছে কি না, এবং থাকলে সেটা ঠিক কোথায় সে তর্ক না-হয় নাই তোলা গেল। মেনে নেওয়া যাক, এ তফাত আছে। কিন্তু প্রভেদমাত্রই উচু নিচুর সম্বন্ধ নয়, এবং বর্তমান পর্যন্ত কাজের পরিমাণও একটা জাতির শক্তিসামর্থ্যের শেষ প্রমাণ নয়। কেননা মানুষের ইতিহাস কিছু শেষ হয়ে যায়নি যে, এখনই লাইন টেনে হিসাব নিকাশ আরম্ভ করা যেতে পারে। আজ যাঁরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও প্রবল, তাঁরা ট্যাসিটাসের জার্মনেরই বংশধর। তখন দাড়ি টেনেছিলেন বলে ট্যাসিটাসের ঠিকে যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে এখন দাড়ি টেনে স্টুয়ার্ট চেম্বারলেইন-এর ঠিকই বা শুদ্ধ হবার সম্ভাবনা কোথায়! আর শ্রেষ্ঠত্ব, তার অর্থ যাই হোক, যদি প্রভুত্বের নিয়োগপত্র হয়, তবে তার শেষ কোথায়? আর্যত্ব এমনকী ইউরোপীয় আর্যত্বের সীমায় এসেই বা তার গতিরোধ হবে কেন? শ্রেষ্ঠের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতমের দাবি কেনই বা না চলবে! কেননা, 'আর্যামি' ভেদেরই মন্ত্র, মৈত্রীর বন্ধন নয়। শোনা যাচ্ছে যে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরেই ফ্রান্সের নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রশিয়ানরা মোটেই আর্য-জাতির লোক নয়, তাঁরা ইউরোপের প্রস্তর যুগের অধিবাসীদের একবারে অবিমিশ্র বংশধর। এবং সে যুগের যে-সব মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে বর্তমান কালের যে মাথার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক মিল, সে হচ্ছে প্রিন্স বিসমার্কের মাথা।

মানুষের সভ্যতা যাঁরা গড়ে তুলেছেন, তাঁরা সবাই অসাধারণ মানুষ। কিন্তু কোনও বিশেষ বংশ, কুল বা জাতি থেকে তাঁরা আসেননি। এবং নিজের বংশ,

কুল বা জাতির সঙ্গে তাদের যে মিল তার চেয়ে অনেক বেশি মিল পরস্পরের সঙ্গে। শুদ্ধোদন যখন শাক্যকুলের সিদ্ধার্থের ভিক্ষুবেশ দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন তখন ভগবান বুদ্ধ তাকে বলেছিলেন যে, এই তাঁর কুলধর্ম; তাঁর বংশ রাজবংশ নয়, বুদ্ধেরা তার পূর্বপুরুষ। প্রকৃতির এই যে ইঙ্গিত, এই হল মানুষের মিলনের সত্য পথের ইঙ্গিত। বংশ, কুল, জাতি কিছুই অসত্য নয়, কিন্তু সে সত্য হল ব্যাবহারিক। এরা কাজ চালাবার উপায়, কিন্তু মৈত্রীর সম্বন্ধ কাজের সম্বন্ধ নয়। এই কাজ চালাবার দলকে ধরে মানুষের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। কেমন দলের সঙ্গে দলের সম্বন্ধ সব সময়েই থাকবে কাজের সম্বন্ধ, সে ‘অ্যালায়েন্সই হোক, আঁতাতই হোক, আর লিগ অব নেশনই হোক। তাতে শান্তি আসতে পারে। কিন্তু মৈত্রী আসবে না। কেননা মৈত্রীর জন্য চাই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, দলের সঙ্গে দলের আদান-প্রদান নয়। এবং সে কেবল তখনই সম্ভব, যখন বংশ, জাতি, রাষ্ট্রের প্রাচীর মানুষের চেয়েও উচু হয়ে উঠে দৃষ্টিকে বাধা না দেয়; যখন নামরূপের মায়া যা এক, তাকে বহু করে দেখানোর কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়।

---

(১) ‘কুলোপদেশেন হয়োহপি পূজ্য
স্তস্মাৎ কুলীনাং স্ক্রিয়মুদ্বহন্তি ॥’ (বশিষ্ঠ-সংহিতা)

বৈশ্য

মনু উপদেশ করেছেন, শূদ্র সমর্থ হলেও ধনসঞ্চয় করবে না। কেননা বহু ধনের গর্বে সে হয়তো ব্রাহ্মণকেও পীড়া দিতে আরম্ভ করবে। অথচ এই ভৃগুসংহিতা যে-সমাজের ধর্মশাস্ত্র তার ধনসৃষ্টি ও ধনসঞ্চায়ের কাজটি ছিল বৈশ্যের হাতে। এ বর্ণটি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রকারের এমন আশঙ্কা হয়নি, সম্ভব তার কারণ বৈশ্য ছিল আর্য সভ্যতার ভিতরের লোক-দ্বিজ। শাস্ত্রের শাসন ছাড়াও তার মনে এই সভ্যতার বাঁধন ছিল, যার টানে কেবল ধনের জোরে বিদ্যা ও বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলার কল্পনা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

বিংশ শতাব্দীর বৈশ্যের অবশ্য কোনও ধর্মশাস্ত্রের বালাই নেই; সভ্যতার বাঁধনকেও সে একরকম কাটিয়ে উঠেছে। কেননা বৈশ্য আজ সভ্যতার মাথায় চড়ে ব্রাহ্মণকে ডেকে বলছে, তোমার কাজ হল আমার কারখানার কল-কবজা গড়া, কাঁচামালকে কেমন করে সস্তায় ও সহজে তৈরি মাল করা যায় তার ফন্দি বাতলানাো; না হয় আমার খবরের কাগজে আমার – মতলবমতো প্রবন্ধ জোগানো। শূদ্রকে বলছে, এসো বাপু! তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে, লেগে যাও আমার কলের কাজে; পেট-ভাতার অভাব হবে না। আর জেনো এই হচ্ছে সভ্যতা, এতে অসূয়া করা মানে দেশদ্রোহ, একেবারে সমাজের ভিত ধরে নাড়া দেওয়া। ক্ষত্রিয়কে বলছে, হুঁশিয়ার থেকে যেন এই যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের তৈরি আমার কলের মাল দিকে দিকে ছুটিল, জলে স্থলে এর গতিকে অবাধ রাখতে হবে, তোমার কামান, বন্দুক, জাহাজ, এরোপ্লেন যেন ঠিক থাকে। বিদেশের বৈশ্য যদি এই বণিকপথের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, নিজে গুড়ো হয়ে তাকে গুড়ো করতে হবে। তাতে দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে তোমারও অক্ষয় কীর্তি লাভ হবে, আমারও গোলাগুলি, রসদ, হাতিয়ারের কারখানার মুনাফা বেড়ে যাবে। আর ঘরেও তোমার কাজের একেবারে অভাব নেই। আমার কলের মজুরেরা অতিরিক্ত বেয়াড় হয়ে উঠলে তাদের উপর গুলি চালাতেও মাঝে মাঝে তোমার ডাক পড়বে।

এই যে বৈশ্যপ্রভুর ব্যবস্থা, যার বর্ণ ধর্ম কথনের প্রথম কথা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এই তিন বর্ণের এক ধর্ম, চতুর্থ বর্ণ বৈশ্যের শুশ্রীষা, এরই নাম "কাপিটালিজম' বা মহাজন-তন্ত্র। এর নাগপাশ গত একশো বছর ধরে ইউরোপীয় সভ্যতাব প্রতি অঙ্গে পাকে পাকে নিজেকে জড়িয়ে এসেছে এবং আজ তার চাপে সে সভ্যতার দম বন্ধ হবার উপক্রম। গত যুদ্ধের কামানের শব্দে ট্রেঞ্চের মধ্যে জেগে উঠে ইউরোপের সভ্যতা এ বজর্বাধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার যে ব্যাকুল চেষ্টা করছে তারই নাম কোনও দেশে 'সোভিয়েট', কোনও দেশে "ন্যাশন্যালিজেশন'।

২

আধুনিক ইউরোপের সমাজ-ব্যবস্থায় যে করে বৈশ্য-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার ইতিহাস বিস্ময়কর কিন্তু জটিল নয়। এর মূল ভিত্তি হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে জড়-বিজ্ঞানের আশ্চর্য উন্নতি, প্রকৃতির সকল কাজের শক্তি ও নিয়মের জ্ঞানের অচিন্তিতপূর্ব প্রসার এবং সে জ্ঞানকে মানুষের ঘরকন্নার কাজে লাগাবার চেষ্টার অপূর্ব সাফল্য। এর ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার স্থূলদেহ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে দেখতে দেখতে একেবারে নবী কলেবর নিয়েছে। সে চেহারা ইউরোপের ও ইউরোপের বাইরের পূর্ব পূর্ব যুগের সমস্ত সভ্যতার চেহারা থেকে একেবারে ভিন্ন রকমের। বাষ্প আর বিদ্যুৎ এই দুই শক্তিকে লোহার বাঁধনে বেঁধে ইউরোপ যে শিল্প, কারু, কৃষি, বার্তা, ব্যাবসা, বাণিজ্য গড়ে তুলেছে তার কাজের ভঙ্গি ও সামর্থ্যের সঙ্গে কোনও যুগের কোনও সভ্যতার সে দিক দিয়ে তুলনা করাই চলে না। যেমন ফরাসি অধ্যাপক সেনোবো লিখেছেন–এদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সঙ্গে আজকার ইউরোপের যে তফাত, অষ্টাদশ

শতাব্দীর ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন মিশরের তফাত তার চেয়ে অনেক কম। বলা বাহুল্য এ তফাত কলকারখানা, রেল স্টিমার, টেলিগ্রাফ টেলিফোনে মূর্তিমান হয়ে রয়েছে। এবং আশা করা যায়, অল্পদিনেই মোটর, এরোপ্লেন সে মূর্তির অদল-বদল ঘটিয়ে এ তফাতকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। কিন্তু এই যে ইউরোপ কারখানায় কলে শিল্পসামগ্রী তৈরি করছে, রেলে স্টিমারে তার পণ্য পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিচ্ছে, টেলিগ্রাফ টেলিফোনে দাম দস্তুর বেচাকেন। চালাচ্ছে, এর ভিতরের লক্ষ্য কিছুই নুতন নয়। সেটি অতি প্রাচীন, মানুষের সভ্যতার সঙ্গে একবয়সি। সে লক্ষ্য হল–কী করে মানুষের জীবনধারণের ও সে জীবনের শোভা সম্পদ বিধানের সামগ্রীগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে জোগান দেওয়া যায়। পশুপালন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবই এই প্রশ্নেরই উত্তর। কেবল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ তার শিল্প-বাণিজ্যের কৌশলে ও ব্যবস্থায় এ সমস্যার যে সমাধান করেছে, জিনিসের জোগান হিসাবে তা তুলনারহিত। যা মানুষের অসাধ্য ছিল তা সুসাধ্য হয়েছে; যা বহুদিন, বহুজন ও বহু আয়াসসাধ্য ছিল সামান্য লোকের নামমাত্র পরিশ্রমে তা মুহূর্তের মধ্যে সাধিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করেছেন, আজ কলের তাঁতে একজনে যে কাপড় বোনে সেটা হাতের তাঁতের ত্রিশজন তাঁতির কাজ; হাতের চরকার এগারোশো জনের সুতো আজ কলের চরকায় একজন কেটে নামাচ্ছে।

কিন্তু এ নব শিল্প-বাণিজ্যের এই যে অদ্ভুত কর্মসমর্থ্য, একে চালনা করতে হলে গুটিকতক উপায় অপরিহার্য। তার মধ্যে প্রধান হল বিপুল আয়তনের উপাদানকে একই জায়গায় একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত করা এবং তার জন্যে চাই বহু লোককে একত্র জড়ো করে তাদের নানারকম মজুরির সাহায্য। আধুনিক কলের দৈত্য, উপকথার দৈত্যর মতোই নিমেষে পর্বতপ্রমাণ কাজ করে ওঠে, কিন্তু সত্যিকার দৈত্য হওয়াতে সে চায় কাজের পরিমাণ মালের জোগান, আর মানুষের হাতের সাহায্য। সুতরাং শিল্প-

বাণিজ্যের এই নূতন কৌশলকে কাজে লাগাতে হলে, চাই দেশ-বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে জমা করা, কল গড়ে কারখানা বসানো, আর সে কল-কারখানা চালাবার জন্য নানারকম বহু মজুর একত্র করা। এবং এ-সবারই জন্য চাই টাকা, অর্থাৎ পূর্বসঞ্চিত ধন। যাতে মাল কেনা চলবে, কল-কারখানা তৈরি হবে, মজুরের মজুরি জোগাবে। এবং সে টাকা অল্পস্বল্প হলে চলবে না, একসঙ্গে চাই বহু টাকা। কেননা এ ব্যাপারের মূল কথাই হচ্ছে, যা পূর্বে নানালোকে নানা জায়গাতে অল্পেস্বল্পে এবং অল্পস্বল্প তৈরি করত, তাই করতে হবে এক জায়গায়, এক তত্ত্বাবধানে, বিদ্যুৎগতিতে আর হাজার গুণ বেশি পরিমাণে। ফলে ইউরোপ জুড়ে কল-কারখানা তারাই বসিয়েছে হাতে যাদের ছিল জমানো টাকা এবং কলের চাকার পাকে পাকে নামতার আর্যার মতো সে টাকা বেড়ে উঠেছে। আর টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলও বেড়েছে। কারখানাও বড় হয়েছে। অর্থাৎ টাকার অঙ্কটাও আর বেড়ে চলেছে। আর এও অতি স্পষ্ট যে এই কলের তৈরি মালের রাশিকে দেশ-বিদেশে কাটাতে হলে চাই বড় মূলধনী ব্যবসায়ী, যাঁরা একদমে একে নিঃশেষ করে কিনে নিতে পারবে। ছোট ছোট ব্যবসামীর হাত দিয়ে ধীরে-সুস্থে এ মাল কাটানোর চেষ্টা করা এ-সব কারখানার মালিকদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। এমনি করে আজকার ইউরোপের যে বিরাট ধনসম্পদ তার একটা প্রকাণ্ড অংশ এসে জমেছে সংখ্যায় অতি অল্প একটি শ্রেণিবিশেষের হাতে—যাঁরা কারখানার মালিক বা সেই কারখানার মালের ব্যবসায়ী। হিসাবে দেখা গেছে যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে (যা ইউরোপের একখণ্ড 'ছিট' মাত্র) দেশের সমুদয় ধনের এক পঞ্চমাংশেরও বেশি রয়েছে লোক সংখ্যার ত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগের হাতে। ধনের গৌরব সব দেশে, সব কালেই ছিল ও থাকবে। সুতরাং এই অতি-ধনী বৈশ্য শ্রেণিটি যে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তিশালী হবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

৩

কিন্তু এই মহাজন সম্প্রদায়টির ইউরোপে যা প্রভাব ও প্রতিপত্তি ধন গৌরবের উপর তার সামান্য অংশই নির্ভর করছে। যার টাকা নেই। সে যার টাকা আছে তাকে দূরে থেকেই নমস্কার করতে পারে যদি না জীবিকার জন্য তার দরজায় দাড়াতে হয়। এইজন্য ইউরোপের পক্ষে তার মহাজন শ্রেণিটিকে কেবল টাকার খাতির দিয়ে দূরে রাখা সম্ভব নয়। কেননা এই শ্রেণিটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপের অন্নদাতা। আর তা দু'রকমে। নূতন শিল্প ব্যবস্থায় দেশজুড়ে ধনসৃষ্টির যেসব ছোটখাটো ব্যবস্থা ছিল তা লোপ পেয়েছে। একমাত্র কৃষি ছাড়া ইউরোপের সমস্ত ধন প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হচ্ছে এই মহাজনদের বড় বড় কারখানায়। এবং কৃষি জিনিসটিও আজ ইউরোপের চোখে অতি অপ্রধান শিল্প। কারণ পশ্চিম ইউরোপ আবিষ্কার করেছে নিজের অন্ন দেশে জন্মানোর চাইতে কলের তৈরি শিল্প-সামগ্রী দিয়ে বিদেশ থেকে তা কিনে আনাই তার পক্ষে বেশি সহজ ও সুবিধার। এবং সে শিল্পের জন্য যে কৃষিলভ্য কাঁচামালের দরকার তার সম্বন্ধেও সেই কথা। ফলে পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ লোকের জীবিকার উপায় হচ্ছে মহাজনদের এই বড় বড় কারখানাগুলিতে ও তাদের অফিসে হাতে বা কলমে মজুরগিরি করা। অর্থাৎ— এই মহাশ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই এদের মনিব ও অন্নদাতা। আর পরোক্ষে ইউরোপের সবারই অন্নবস্ত্র এরাই জোগাচ্ছে। জীবনযাত্রার যা কিছু উপকরণ তা হয়ে আসছে এদের কারখানা থেকে, নয় তো এদেরই কারখানার কলে তৈরি মালের বিনিময়ে। যাদের হাতে জীবন-মরণের কাঠি রয়েছে তাঁরা যে সর্বময় হয়ে উঠবে এতে আর বিস্ময় কী!!

কিন্তু এ বৈশ্য-প্রভুত্বের সবচেয়ে যা প্রধান কথা তা হচ্ছে আধুনিক যুগের নূতন ব্যবস্থায় এই যে-সব অতিকায় শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান মহাজনদের মূলধনে ও চেষ্টায় গড়ে উঠেছে এগুলি যত লোকের অন্ন জোগাচ্ছে এর পূর্বে ইউরোপের পক্ষে তা অসাধ্য ছিল। আর অন্ন বাড়লে যে জীবও বাড়ে এটা

প্রাণবিদ্যার একবারে প্রথম ভাগের কথা। ফলে গেল একশো বছরের মধ্যে ইউরোপের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। এবং এখন এ বিরাট জনসংঘের জীবিকা জোগাতে হলে ইউরোপের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের চাকা একদিনও অচল হলে চলবে না। এর আয়তন যদি একটু খাটো কি বেশ একটুকু মন্দা হয় তবে ইউরোপ তার সমস্ত লোকের মুখে আর অন্ন দিতে পারবে না। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বাণিজ্যে যে লোক বেড়েছে, বিংশ শতাব্দীতে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে সেই শিল্প-বাণিজ্য ছাড়া আর গতি নেই, এ যে কত সত্য জার্মান যুদ্ধের এক আঁচড়েই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের ধাক্কায় এ শিল্প-বাণিজ্যের কল যেই একটু বিকল হয়েছে অমনি ইউরোপ জুড়ে কলরব; ইংল্যান্ডে চিনি নেই, ফ্রান্সে কয়লা নেই, জার্মনিতে চর্বির জন্য হাহাকার, অস্ট্রিয়ায় দুধ না পেয়ে শিশু মরছে। আর একথা আরও স্পষ্ট হয়েছে, গেল-যুদ্ধের ফলে মূলধনী মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রকম-সকমে। রুশিয়ার বোলশেভিক, জার্মানির সোস্যালিস্ট, কি ইংল্যান্ডের ন্যাশান্যালিজেশন পন্থী এমন কথা কারও মুখে ওঠেনি যে, এই যে আধুনিক ইউরোপের দৈত্যাকৃতি সব শিল্প-বাণিজ্য, যা কলের ও কাজের চাপে মানুষকে পিষে ফেলছে, একে ভাঙা দরকার। কেননা ইউরোপ মর্মে মর্মে জানে যে, এই শিল্প-বাণিজ্যই তার প্রাণ। একে মারতে গেলে মরতে হবে। তাই এখন সবারই লক্ষ্য কী করে এই শিল্প-বাণিজ্যকেই বহাল ও সচল রাখা চলে, কিন্তু তার বর্তমান মালিক মহাজনদের ছেটে ফেলা যায়। এ চেষ্টা সফল হবে কি না তা ইউরোপের ভাগ্যবিধাতাই জানেন। কিন্তু যত দিন না হবে, ততদিন বৈশ্য ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের মাথায় চড়েই থাকবে। কেননা ইউরোপের মুখের অন্ন তার হাতের মুঠোয়।

বলা বাহুল্য ইউরোপের বৈশ্য-প্রভুত্বের বেগ কেবল ইউরোপ বা ইউরোপিয়ান জাতিগুলির মধ্যেই আবদ্ধ নেই; পৃথিবীময় সে নিজেকে জানান দিচ্ছে। কেননা ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর প্রভু। এবং স্বভাবতই এ প্রভুত্বের প্রয়োগ হচ্ছে ইউরোপের প্রভু বৈশ্যের মারফত, তারই সুবিধা ও প্রয়োজনমতো। ইউরোপের বিজ্ঞান আজ বাহুবলে ইউরোপকে অজেয় ও দুর্নিবার করেছে। এবং সমস্ত পৃথিবী প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ইউরোপের জিত রাজ্য। কিন্তু এ জয় অশ্বমেধের রাজচক্রবর্তীর জয় নয়। যুদ্ধের উল্লাস কি জয়ের গৌরব এর লক্ষ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হল জিত দেশ ও পরাজিত জাতিকে ইউরোপের কারখানার কলের চাকায় জুড়ে দেওয়া। যে শিল্প-বাণিজ্য ইউরোপকে অন্নবস্ত্র দিচ্ছে ইউরোপের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ তার চাই-ই চাই। সেখানকার মাটির রস টেনেই ওরা বেঁচে রয়েছে। যে কাঁচামাল কলে-তৈরি শিল্পে পরিণত হবে, তা প্রধানত আসছে ইউরোপের বাইরে নন-ইউরোপিয়ান লোকদের দেশ থেকে। জীবনযাত্রার যে-সব উপকরণ, বিশেষ করে খাদ্য, যা ইউরোপের মাটিতে জন্মে না বা কলে গড়া চলে না, তাও বেশির ভাগ আনতে হবে ওখান থেকেই। অবশ্য এ দুই জিনিস ইউরোপ গায়ের জোরে কেড়ে নিতে চায় না। তার কারখানার তৈরি শিল্পের বিনিময়েই কিনতে চায়। কিন্তু এদের জোগান যাতে অব্যাহত, আর পরিমাণ যাতে প্রয়োজনমতো হয় সে ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। কেননা কারখানার কল একদিনও বসে থাকলে চলবে না। সুতরাং এ-সব গরম দেশের অলস লোকেরা যদি নিজের ইচ্ছায়, অথবা লাভের লোভে এ-সব জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করে সুবিধা দরে জোগান দিতে না চায় তখন ইউরোপকে বাধ্য হয়েই হাতে চাবুক নিতে হয়, সঙিনের খোচায় এদের কাজের ইচ্ছাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। এমনকী দুই-চারজনার হাত পা কেটে দিয়ে তাদের বাকি সঙ্গীদের হাত-পা’গুলো যাতে কলের চাকার বেগের সঙ্গে তাল রাখতে উৎসাহী হয়। সে চেষ্টা থেকেও পশ্চাৎপদ হলে চলে না। জার্মান অধ্যাপক নিকলাই তার যুদ্ধ ও জীবতত্ত্ব’ নামের পুথিতে লিখেছেন যে,

পৃথিবীর পঞ্চাশ কোটি ইউরোপিয়ান ও ইউরোপ থেকে ছড়িয়ে-পড়া শ্বেত মানুষের হাতে এখনই এমন যন্ত্রপাতি আছে যে, আসছে বিশ বছরের মধ্যে তাঁরা পৃথিবীর একশো কোটি নানা জাতির অ-শ্বেত মানুষদের একেবারে নির্মূল করে উচ্ছেদ করতে পারে। এবং ফলে সমস্ত পৃথিবীটা কেবলমাত্র, অন্তত নিজেদের চোখে, উন্নততর শ্বেত জাতিদেরই বাসস্থল হয়। এ বিশ বছরের পরে, অর্থাৎ— যখন চিন তার সমস্ত লোককে আধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধ-বিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলবে এবং নিজের 'ড্রেডনট' ও কামান গোলা নিজেই তৈরি করতে শুরু করবে, যেমন এখন জাপান করছে, হয়তো এ আর সম্ভব হবে না। কিন্তু ইউরোপ যে এ-কাজে হাত দেবে না তা নিশ্চয়, কেননা ব্যাপারটা এমন ভয়ানক যে কল্পনায় তাকে ফুটিয়ে তুললেই পিছিয়ে আসতে হয়। এবং অধ্যাপক নিকলাই-এর মতে এ জেহাদ প্রচার করা মানে স্বীকার করা যে প্রকৃত জীবনযুদ্ধে, যেখানে জয়ী হতে হয় পরকে মারার শক্তিতে নয়, নিজের বাঁচার শক্তিতে, শ্বেতের চেয়ে অ-শ্বেত শ্রেষ্ঠ। সুদূর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনায় এখানে একটা হাতের কাছের মোটাকথা চোখ এড়িয়ে গেছে। ইউবোপ যদি আসছে বিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব অ-শ্বেত জাতিগুলিকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয় তবে তার পরের দশ বছরের মধ্যে ইউরোপ আর বর্তমান ইউরোপ থাকবে না। তার কল-কারখানার বেশির ভাগই অচল হবে। তার শিল্প-বাণিজ্য সমাজ-রাষ্ট্র সব ব্যবস্থারই মুলে টান পড়বে। কারণ পৃথিবীজুড়ে শস্যক্ষেত্রে, মাঠে, অরণ্যে যে-সব কৃষ্ণ, তাম্র, পীত হাত দ্রব্যসম্ভার জুগিয়ে ইউরোপের সভ্যতার স্থূল শরীরকে স্থূলতর করে তুলছে তার সবগুলিকে যদি সাদা হাত দিয়ে বদল করতে হয় তবে কারখানার কলে দেবার মতো হাত ইউরোপে আর বেশি অবশিষ্ট থাকে না। ইউরোপের লোকসংখ্যার ইউরোপে বসে অন্নসংস্থান অসম্ভব হয়। যে-সব ভিত্তির উপর ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে একটা প্রধান হল নন-ইউরোপিয়ান ও অ-শ্বেত লোকদের পরিশ্রমের ফল সহজে ও স্বল্পমূল্যে পাওয়া। প্রাচীন গ্রিক-

রোমান পণ্ডিতেরা দাসের শ্রম বাদ দিয়ে নিজেদের সভ্যতার অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারতেন না। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে পারেন তার কারণ না◌েমরূপের বদল ঘটালে জানা-জিনিস চিনতে পণ্ডিতদের কষ্ট হয়; আর মনে যা ওঠে তা স্পষ্ট করে খুলে বলার অভ্যাস প্রাচীন পণ্ডিতদের যত ছিল আধুনিক পণ্ডিতদের তা নেই।

ইউরোপের বৈশ্য-প্রভুত্বের খোঁচা এমনি করে ইউরোপের বাইরে তাম্র কালো পীত সব রঙের লোকের গায়ে এসেই বিঁধছে। ইউরোপের বৈশ্য চায়। এরা নিরলস হয়ে তার কারখানার কাজের উপাদান আর মজুরের খাদ্য জোগায়। কিন্তু এ ছাড়া এর আরও একটা দিক আছে। ইউরোপ যেমন এদের কর্মশীলতা চায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চায়। এ কর্মক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে না। ওঠে এবং বিপথে না চলে। শিল্পের উপাদান জোগান এবং কৃষি পশু থেকে খাদ্য উৎপাদন, এতেই নিঃশেষ না হয়ে যদি এদের শক্তি ও বুদ্ধি নবশিল্পের নূতন বিদ্যা শিখে উপাদানকে শিল্পদ্রব্যে পরিণত করার দিকে চলে সেটা ইউরোপের চোখে অমঙ্গল। কেননা ইউরোপের আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের মোটকথা বাকি পৃথিবী উপাদান ও খাদ্য জোগাবে, আর ইউরোপ ওই উপাদান থেকে তৈরি শিল্পদ্রব্যের এক অংশ বিনিময়ে ফিরিয়ে দেবে। যদি এ ব্যবস্থা উলটে গিয়ে খাদ্য ও শিল্পসামগ্রী দুই-ই বাইরে থেকে ইউরোপের দরজায় উপস্থিত হয় তবে বদল দিয়ে এদের ঘরে নেবার মতো জিনিস ইউরোপের বড় বেশি থাকবে না। কেননা ইউরোপ যে শিল্প-বাণিজ্যে আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে সে তার দেশের প্রকৃতির গুণে নয়, লোকের প্রকৃতির গুণে। কিন্তু এ কথা যেমন গৌরবের তেমনি আশঙ্কার। যে-সব দেশে প্রকৃতি ইউরোপের চেয়ে অকৃপণা, সে দেশের লোকের মনের পঙ্গুত্ব ও শক্তির খর্বতার উপর এ শ্রেষ্ঠত্ব টিকে আছে। মন সচল হলেও যে ইউরোপের শিল্প-বাণিজ্যের নূতন কৌশল শিখে শক্তি সঞ্চয়ে দেরি হয় না তার পরিচয় জাপান দিয়েছে। এবং যেখানেই এ পরিচয়ের আভাস পেয়েছে, ইউরোপ তার নাম দিয়েছে 'আতঙ্ক'। কারণ

ইউরোপের বিশ্বপ্রেমিকেরা যা-ই বলুন-না, ধন ও শক্তিতে ইউরোপ এখন যেমন আছে তেমনি থাকবে, আবার বাকি পৃথিবীটাও ধনী ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় এর কোনও সম্ভাবনা নেই। ইউরোপ প্রধান হয়েছে, আর সবাই ছোট ও খাটো আছে বলে। সে প্রাধান্য বজায় থাকবে – আর সবাইকে ছোট ও খাটো করে রাখতে পারলে।

৫

বৈশ্য-ইউরোপের চাপ পৃথিবীর যে-সব প্রাচীন সভ্য জাতিগুলির উপর এসে পড়েছে তাদের সবারই মনে হয়েছে ওর হাত থেকে রক্ষার উপায় ওই বৈশ্যত্বকে ধার করে তার উপর শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়া। কেননা চোখে দেখতে ইউরোপের বাহুতে বল দিচ্ছে তার সব অদ্ভুত কৌশলী কাজের সরঞ্জাম ও উপকরণের বিচিত্র বাহুল্য। আর এ সরঞ্জাম ও উপকরণ সবই জোগাচ্ছে তার বৈশ্যের কর্মব্যবস্থা। প্রাচ্য দেশের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচ্য জাপান পাশ্চাত্যের এই কর্মকৌশল অল্পদিনেই আয়ত্ত করেছে। এবং ফলে পশ্চিম ইউরোপের প্রবল জাতিগুলির মতো ইউরোপের চোখে সেও একটা প্রধান জাতি। তারও কারখানার কলে ইউরোপের মতো মজুর খাটিয়ে শিল্প-সামগ্রী তৈরি হচ্ছে; সেগুলো জাহাজে উঠে পৃথিবীর বাজারের যত ফাঁক জায়গা দরকারি, অদরকারি, সাচ্চা, ঝুঁটো, ভারী ও ঠুনকো মালে ভরে দিচ্ছে, এবং আর সবার মাল সরিয়ে নিজের জন্য কতটা জায়গা খালি করা যায় তার চেষ্টা দেখছে। মহাজনি-জাহাজের পেছনে তারও মনোয়ারি জাহাজ সেজে রয়েছে; এবং পৃথিবীর শান্তির জন্য ইউরোপের আর পাঁচজন শান্তিপ্রয়াসীর মতো সেও কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি তৈরি করে যাচ্ছে। বিশ্বহিতের বাণী তার মুখ থেকেও সমান তেজে ও সমান বেগেই বেরোচ্ছে; এবং মানবজাতির

সভ্যতা রক্ষা ও বিস্তারের জন্য দুর্বল জাতির সুফলা দেশের গুরুভার বহনে তার পীত-স্কন্ধের ঔৎসুক্য কোনও শ্বেত-স্কন্ধের চেয়ে কম নয়। বৃদ্ধ চিন ডাইনে ইউরোপ ও বাঁয়ে জাপান দুদিক থেকে খোঁচা খেয়ে ওই বৈশ্যত্বের দিকে লুব্ধনেত্রে তাকাচ্ছে। কিন্তু তার প্রাচীন সভ্যতার গভীর শিকড়, আর প্রকাণ্ড দেহের বিরাট বিপুলতা তাকে সোজাসুজি ইউরোপের বৈশ্যত্বের পাঠশালায় ঢুকতে দিচ্ছে না। ইউরোপের নবীন বিদ্যার বেগ তার প্রাচীন সভ্যতাকে একটা নূতন সৃষ্টির পথে নিয়ে যাবে, এশিয়া সেই আশায় তাকিয়ে আছে। এবং সমস্ত বাধা কাটিয়ে পাছে চিন নিজের বৈশ্যমন্ত্রে জাপানের মতোই সিদ্ধিলাভ করে সেই আতঙ্কে ইউরোপ মাঝে মাঝে চার দিক হলদে দেখছে।

আমাদের ভারতবর্ষে এ বৈশ্য-তন্ত্রের খাস তালুক। কেননা এ মহাদেশ ইউরোপের সেই দেশের অধীন রাজ্য যেখানে বৈশ্য-তন্ত্রের মূর্তি সবচেয়ে প্রকট, আর বৈশ্য-প্রভুত্বের মহিমা সবচেয়ে উঁচু। এবং 'কনস্টিটিউশন্যাল ল'র পুথিতে যাই থাকুক আমরা সবাই জানি ব্রিটেনের বৈশ্যরাজই আমাদের রাজা। স্বভাবতই প্রজার জাতির চোখে উন্নতি মানে রাজার জাতির মতো হওয়া। সেইজন্য আমাদের দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশার কথা যখনই ভাবি তখন সহজেই মনে হয় এর প্রতিকারের উপায় ভারতবর্ষকে বিলাতের মতো বড় বড় কারখানায় ভরে ফেলা; দেশের লোককে গ্রামের মাটি থেকে উপড়ে এনে শহরের কলে জুড়ে দেওয়া। এবং সেজন্য সর্বপ্রথম দরকার সকলে মিলে বৈশ্যকে দেশের মাথায় তোলা যাতে যার-ই মগজে বুদ্ধি আর মনে উৎসাহ আছে তার দু'চোখ এদিকে পড়ে। আমাদের সরকারি বে-সরকারি রাজপুরুষেরাও ভারতবর্ষের যে-জাতি বৈশ্যমহিমা যতটা আয়ত্ত করেছে তাকে ততটা উন্নত বলে স্বীকার ও প্রচার করেন। এবং আমাদের বড়-ছোটর প্রমাণ যে তাদের হাতের মাপকাঠি সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হবে যে এ মাপে বাঙালির উন্নতির বহর বড় বেশি নয়। আরব সমুদ্রের তীরের দুই-একটি জাতির কাছে তো আমরা দাঁড়াতেই পারি না। এমনকী যাঁরা বাংলার বাইরে থেকে কেবল পাগড়ি কি টুপি নিয়ে এসে বাংলার বুকের উপর দিয়ে মোটর হঁহাকাচ্ছেন, তাদের পাশেও আমরা নিতান্ত খাটো। আমাদের নিত্য দুঃখ-দৈন্যের চাপিটা যখনই কোনও নৈমিত্তিক কারণে একটু বেড়ে ওঠে তখনই এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের আন্দোলন, আলোচনা, ধিক্কার, অনুশোচনার সীমা থাকে না। কলেজ-ফেরত বাঙালির ছেলে নিরক্ষর অ-বাঙালির ব্যবসায়ে কেরানিগিরির উমেদার, এই উদাহরণ তুলে আমরা বাঙালির মতি গতি এবং সর্বোপরি আমাদের বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দুরবস্থা স্মরণ করে যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। এ শিক্ষা যে কেবল ব্যর্থ নয়, উন্নতির পথে পায়ে শিকল তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কেননা শিক্ষিত বাঙালির চেয়ে যে নিরক্ষর দিল্লিওয়ালা শ্রেষ্ঠ এর পরিচয় তো একের মোটরকার ও অন্যের ছেড়া জুতোতেই সুপ্রকাশ। কিন্তু বাঙালির মনের এমনই মোহ যে এর প্রতিকারে কেউ স্কুল কলেজ তুলে দেবার উপদেশ দেয় না। প্রস্তাব হয় এগুলিতে অন্যরকম শিক্ষা দেওয়া হোক। শিল্পবিদ্যালয় ও কারবার শেখার স্কুলে দেশটা ভরে ফেলা যাক। অথচ সকলেই জানি মোটরবিহারী দিল্লিওয়ালা কি শিল্প, কি সওদাগরি কোনও স্কুলেই কোনওদিন পড়েনি।

জার্মানযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে পৃথিবী-জোড়া দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা অতি সংকটের জায়গায় এসে পৌছেছে। এ সংকট যে কত বড়, আর আমাদের দারিদ্র্যের ব্যাধি যে কত প্রবল তা আমরা এর যে-সব বিষ-চিকিৎসার ব্যবস্থা দিচ্ছি। তা দেখলেই বোঝা যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার উষ্চশিক্ষিত ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন, ‘সবাই মাড়োয়ারি হও; আর উপায় নেই।’ এ কথা বেরিয়েছে তার মুখ থেকে যার সমস্ত জীবন বৈশ্যত্বের একটা প্রতিবাদ। ধনের গৌরব ও ক্ষমতার মোহ যার কাছে

প্রলোভনের জিনিসই নয়। যাঁর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য আর ঋষির তপস্যা বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ভারতবর্ষেও জ্ঞানের তপোবন ও শিষ্যের মণ্ডলী গড়ে তুলেছে। যিনি বিদ্যা ও প্রতিভা দিয়েছেন দেশের সেবায়, নিজেকে লোপ করে। এ যুগে যিনি কারখানা গড়ে তুলেছেন নিজের পকেট নয় দেশের মুখ চেয়ে। আর ‘মাড়োয়ারি হওয়া’ ব্যাপারটি কী তা গেল-যুদ্ধের টানে সবার সামনে বে-আবু্ হয়েই দেখা দিয়েছে। মাড়োয়ারিগিরি হচ্ছে ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের কবন্ধ। ইউরোপের বৈশ্য পৃথিবীই লুট করুক, আর দেশের মাথায়ই চড়ে বসুক, দেশকে সে ঠিকই অন্ন জোগাচ্ছে। আজকের ইউরোপের ধনসৃষ্টির সে যে মূল উৎস তাতে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু মাড়োয়ারিগিরি ধনসৃষ্টির পথ দিয়েই হাঁটে না। ব্যাবসা-বাণিজ্যের ওই উত্তমাঙ্গটি তার নেই। তার কাজ হল বিদেশের তৈরি জিনিস চড়া দরে দেশের মধ্যে চালানো, আর দেশের উৎপন্ন ধন সস্তা দরে বিদেশির হাতে তুলে দেওয়া। এবং এই হাত বদলানোর কারবার থেকে যত বেশি সম্ভব দেশের ধন, যার সৃষ্টিতে তার কড়ে আঙুলেরও সাহায্য নেই, নিজের হাতে জমা করা। সেজন্য যে তীব্র লোভ ও একাগ্র স্বার্থপরতা দরকার তার নাম ব্যাবসা-বুদ্ধি। এ ব্যাবসা-বুদ্ধি যে কত বড় নির্লজ্জ আর কতদূর হৃদয়হীন গেল-যুদ্ধের সময় পৃথিবীর সব দেশে তা প্রমাণ হয়েছে। দেশের নিতান্ত দুর্দশা ও সংকটের সময়ও দেশ-জোড়া দুরবস্থার ভিত্তির উপর নিজের ধনের ইমারত গড়ে তুলতে কোনও দেশের কোনও বৈশ্য কিছুমাত্র গ্লানি বোধ করেনি। এবং এক রাজদণ্ডের শাসন ছাড়া এদের নিষ্ঠুরতা আর কোনও কিছুরই বাধা মানেনি।

ধনসৃষ্টির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক সওদাগরি ইউরোপেও যথেষ্টই আছে। কিন্তু সেখানে সেটা ধন উৎপাদন ও ধন বিতরণের আনুষঙ্গিক উপদ্রব। আর মাড়োয়ারিগিরি হল নিছক উপদ্রব। উৎপাত এটা যেমন হাস্যকর তেমনি সংকটজনক। দেশের কৃষক নিরন্ন বলে স্বল্পমূল্যে তার শ্রমের ফল হতে জমা করে দেশের লোক নিরুপায় বলে চড়া দামে তা বিক্রি করার মধ্যে কোথায়

যে দেশের ধনবৃদ্ধি ও উপকার আছে তা অর্থ-নীতিশাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়েরাও আবিষ্কার করতে পারবেন না। আর গলা যদি নেহাতই কাটা যায়। তবে ছুরিটা বাঙালির না হয়ে অ-বাঙালির এতে এমনকী ক্ষুব্ধ হবার কারণ আছে। সম্ভাবনাটা সুদূর, কিন্তু যদি সত্যই বাংলার গোটা শিক্ষিত-সমাজটা 'মাড়োয়ারি'ই হয়ে ওঠে। তবে নিশ্চয় জানি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই সবার আগে বলবেন এর চেয়ে বাঙালিজাতির না খেয়ে মরাই ভাল ছিল।

৬

ইউরোপের বৈশ্যত্ব বাংলার মাটিতে ভাল ফলেনি। অথচ ইউরোপের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ভারতবর্ষের সব জাতির চেয়েই বেশি। বাংলার বাইরে বাঙালি তো একরকম খ্রিস্টান বলেই পরিচিত। কথা এই যে, যে ইউরোপের সঙ্গে বাঙালির নাড়ির যোগ সেটা বৈশ্য ইউরোপ নয়, ব্রাহ্মণ ইউরোপ। কল-কবজ ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের আধুনিক ইউরোপ ছাড়াও আর একটা আধুনিক ইউরোপ আছে, যে ইউরোপ প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী, যে আধুনিক ইউরোপ মানুষের মনকে মুক্তি দিয়েছে, জ্ঞানের দৃষ্টি যেমন সূক্ষ্ম তেমনি উদার করেছে। যার কাব্য, সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডার জ্ঞান, সত্য, সৌন্দর্যে ভরে দিয়েছে। এই ইউরোপের আনন্দলোকই বাঙালির মন হরণ করেছে, কলের ধোঁয়ায় কালো ইউরোপ নয়। সেইজন্য বাংলার মাটিতে এখনও জামসেটজি তাতা জন্মোনি, কিন্তু বাংলাদেশ রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি। এখনও বড় কলওয়ালা কি ভারী সওদাগরের আমরা নাম করতে পারিনে, কিন্তু জগদীশ বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালি জাতির মধ্যেই জন্মেছেন। বাঙালির নাড়িতে পশ্চিম থেকে প্রাচীন

ভারতীয় আর্য ও মধ্যযুগের মুসলমান সভ্যতা, দক্ষিণ থেকে দ্রাবিড় ও পূর্ব থেকে চিন সভ্যতার রক্ত এসে মিশেছে। ইউরোপীয় আর্য-সভ্যতার বিদ্যুৎস্পর্শে যদি এই অপূর্ব প্রয়াগ-ভূমিতে আমরা একটি অক্ষয় নূতন সভ্যতা গড়ে তুলে মানবজাতিকে দান করতে পারি। তবেই আধুনিক বাঙালি জাতির জন্ম সার্থক। না হলে আমরা পায়ে হেঁটে চলি কি মোটরগাড়িতে দৌড়াই, তাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এ সার্থকতার জন্য ইউরোপের যে উৎস থেকে জ্ঞান ও সৌন্দর্য উৎসারিত হচ্ছে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে যেখানে তার কারখানায় মাল তৈরি হচ্ছে সেখানে দু'চোখ বদ্ধ করে রাখলে চলবে না; বাঙালির মাড়োয়ারি হওয়া একেবারেই পোষাবে না।

বাঙালিকে অবশ্য আগে বাঁচতে হবে। কিন্তু সেজন্য চাই নূতন ধন সৃষ্টি করা, দেশের অন্নকে বহু করা। বেদের ঋষি অন্নের সৃষ্টির জন্য নিজের হাতে হাল ধরেছেন। আজ পৃথিবীর সেই দিন এসেছে। যখন অন্নসৃষ্টির ভার কেবল বৈশ্য বহন করতে পারে না। তার ব্রাহ্মণের সাহায্য চাই। এই সাহায্য বাঙালির জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষকে দান করবে। যার চোখ আছে তিনিই এর আরম্ভ দেখতে পেয়েছেন। বৈশ্যত্বের নামে নয়, এই ব্রাহ্মণত্বের নামে ডাক দিলে তবেই নবীন বাঙালির সাড়া পাওয়া যাবে। এই ব্রাহ্মণত্বের ছায়ায় বাংলাদেশে এমন বৈশ্যত্ব গড়ে উঠুক। যার হাতে ধন দেখে কি শাস্ত্রকার কি দেশের লোক কেউ ভীত হবে না। যে বৈশ্য প্রাচীন সংহিতার অনুশাসন মত 'ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ যত্নমুত্তমম্, ধর্মানুসারে দ্রব্যবৃদ্ধির জন্য উত্তম যত্ন করবে; দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ, এবং অতি যত্নে সর্বভুতকে পর্যাপ্ত অন্ন দান করবে।

সবুজের হিন্দুয়ানি

সম্পাদক মহাশয় শুনেছেন অনেকের আশঙ্কা, নবপর্যায়ের ‘সবুজপত্র’ নাকি হবে জীর্ণ হিন্দুয়ানির আতপত্র। কথা কী করে রটলো বলা যায় না, তবে এ কথা বলা যায় যে, ভয় একেবারে অমূলক নয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বয়স হয়ে আসছে; আর প্রথম বয়সের ইংরাজি-পড়া তার্কিক যে শেষ বয়সে শাস্ত্রভক্ত গোঁড়া হিন্দু–এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। কাজেই যাদের ভাবনা হয়েছে পুনরুদগত ‘সবুজপত্র’ আধুনিকতার প্রখর রশ্মি থেকে প্রাচীন হিন্দুত্বকে ঢেকে রাখবে, তাদের ভয়কে অহেতুক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মটা খাটে না। কারণ তিনি কেবল ইংরেজিনবিশ নন, ইউরোপের আরও দু-একটা আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যনবিশ; যার ফলে ইংরেজি মদের নেশা কোনওদিনই তাকে বেসামাল করতে পারেনি। আর হিন্দুশাস্ত্রচর্চাও তিনি শেষ বয়সে ‘বঙ্গবাসী’র অনুবাদ মারফত আরম্ভ করেননি, তরুণ বয়স থেকেই শাস্ত্রকারদের নিজ হাতের তৈরি খাঁটি জিনিসে নিজেকে অভ্যস্ত করে এসেছেন। এখন আর ওর প্রভাবে ঝিমিয়ে পড়বার তাঁর কোনও সম্ভাবনা নেই।

এ কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু হিন্দুত্ব ও হিন্দুশাস্ত্রের উপর চৌধুরী মহাশয়ের ভক্তি যে গোঁড়া গদগদ ভক্তি নয়, তার যথার্থ কারণ এ দুয়ের উপর তাঁর অসীম প্রীতি, কেননা ওখানে তার নিগূঢ় মমত্ববোধ রয়েছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও চৌধুরী মহাশয়ের শরীরে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের রক্তের ধারা কতটা অক্ষুন্ন আছে, এ নিয়ে হয়তো শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তর্ক তুলতে পারেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ও মনোভাব যে প্রাচীন আর্য শাস্ত্রকারদের বুদ্ধি ও মনোভাবের অক্ষুন্ন ধারা, এতে আর তর্ক চলে না। শাস্ত্রকার মনু কি ভাষ্যকার মেধাতিথি, এঁদের সঙ্গে আজ মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলে তাঁরা অবশ্য

চৌধুরী মহাশয়কে নিজেদের বংশধর বলে চিনতে পারতেন না; বরং পোশাক পরিচ্ছদ, চাল-চলনে প্রত্যন্তবাসী কশ্চিৎ ম্লেচ্ছ বলেই মনে করতেন। কিন্তু দু'-চার কথার আদানপ্রদানে টপ হ্যাট ও ফ্রক কোটের নীচে যে মগজ ও মন রয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয় হবামাত্র তাঁরা নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয়কে এই বলে আশীর্বাদ করতেন–

'আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সজীব শরদাং শতম্।'

'হে পুত্র! আমাদের আত্মাই তোমাতে জন্ম পরিগ্রহ করেছে। তুমি শত বৎসর পরমায়ু নিয়ে অযজ্ঞীয় ম্লেচ্ছপ্রায় বঙ্গদেশে ইস্পাতের লেখনীমুখে আর্যমনোভাব প্রচার ও তার গুণ কীর্তন কর।'

এই আর্যমনোভাব বস্তুটি কী, একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক। কারণ প্রমথবাবু যদি 'সবুজপত্রে' হিন্দুয়ানি প্রচার করেন, তবে এই মনোভাবেরই প্রচার করবেন।

যে প্রাচীন আর্যেরা হিন্দুসভ্যতা গড়েছে, তাদের সকলের মনোভাব কিছু একরকম ছিল না। হিন্দুসভ্যতার জটিল বৈচিত্র্য দেখলেই তা বোঝা যায়। যাঁরা উপনিষদ রচেছে ও যাঁরা ভক্তিশাস্ত্র লিখেছে; পুরুষার্থ সাধন বলে যাঁরা যাগযজ্ঞবিধির সূক্ষ্ম বিচার ও বিচারপ্রণালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেছে; ও যাঁরা চতুরার্য সত্য ও অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ করেছে; যাঁরা শ্রুতিকে ধর্মজিজ্ঞাসুদের পরম প্রমাণ বলেছে; ও যাঁরা বলেছে বেদ লোকযাত্রাবিদদের লোকনিন্দ থেকে রক্ষার আবরণ মাত্র(১); ন্যায়-দর্শন যাদের তত্ত্বপিপাসার নিবৃত্তি করেছে, ও যাঁরা অখণ্ড অদ্বয়-বাদে না পৌছে থামতে পারেনি–তারা সবাই ছিল আর্য, এবং হিন্দুসভ্যতা গড়ার কাজে সবারই হাত আছে। একদল অনুশাসন দিয়েছে গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবঋণ ও প্রজোৎপাদনে পিতৃঋণ

শোধ দিয়ে তবে বানপ্রস্থী হয়ে মোক্ষ চিন্তা করবে, নইলে অধোগতি হবে; অন্য দল উপদেশ করেছে যেদিন মনে বৈরাগ্য জগবে সেইদিনই প্রব্রজা নেবে। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যবৃদ্ধির উপায় রাজাকে শেখাবার জন্য একদল 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেছে; অপর দল 'ধর্মশাস্ত্র' লিখে সে পথ দিয়ে হাঁটতে রাজাকে মানা করেছে। কেউ বলেছে পুত্রের জন্মমাত্র সে পৈতৃক ধনে পিতার মতোই স্বত্ব লাভ করে, কেউ বিধান দিয়েছে পিতা যতদিন বেঁচে আছে পুত্রের ততদিন কোনও স্বত্ব নেই। যে লৌকিক প্রবচন বলে, এমন মুনি নেই যার ভিন্ন মত নেই, তার লক্ষ হিন্দু-সভ্যতা-স্রষ্টাদ্দের এই মতবিরোধের বৈচিত্র্য।

এতে আশ্চর্য কিছু নেই, বিশেষত্বও কিছু নেই। যে-কোনও বড় সভ্যতার মধ্যেই এই বিরোধ ও ভেদ দেখতে পাওয়া যাবে। সভ্যতা হল মনের স্বচ্ছন্দ লীলার সৃষ্টি। বহু মনের লীলাভঙ্গি বিচিত্র না হয়ে যদি সৈন্যের কুচের মতো একেবারে একতন্ত্র হত, তবে সেইটেই হত অতি আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু তবুও যদি জাতি-বিশেষের নামে কোনও সভ্যতার নামকরণ করি, যেমন হিন্দুসভ্যতা-তখন যে কেবল এই খবর জানাতে চাই যে, কতকগুলি বস্তুজগতের ও মনাোরাজ্যের সৃষ্টি বংশপরম্পরাক্রমে মোটামুটি এক জাতির লোকের কাজ, তা নয়। প্রকাশ্য বা নিগূঢ়ভাবে এই ইঙ্গিত প্রায় সকল সময়ে থাকে যে, ওই সব বিচিত্র, বিভিন্ন, এমনকী বিরোধী সৃষ্টিগুলির মধ্যে একটা ঐক্যের বাঁধন আছে, যে ঐক্য কেবল জন্মস্থান-সমতার ঐক্য নয়, ভাবগত ও রুচিগত ঐক্য। খুব সম্ভব। এ ঐক্যের মূল ওই জন্মগত ঐক্য। কারণ ওই সৃষ্টিগুলির যাঁরা কর্তা, তাদের শিরার রক্ত ও মাথার মগজের এক মূল জীব থেকে উৎপত্তি, এবং তাদের প্রাকৃতিক ও মানসিক পারিপার্শ্বিকও অনেক অংশে এক। অতিবড় প্রতিভাশালী স্রষ্টাও এর প্রভাব এড়াতে পারে না ও এড়াতে চায় না। ফলে তাদের সৃষ্ট সভ্যতা তার বহুমুখী বৈচিত্র্য ও নানা পরিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যেও ভিতরের কাঠামোখনি প্রায় বাহাল রাখে। ঘরের চাল বদলে যায়, দরজা জানালার পরিবর্তন হয়, পুরনো বেড়া তুলে ফেলে

নতুন বেড়া বসানো হয়, কিন্তু মাঝের 'ফ্রেমটি বজায় থাকে। আর্যমনোভাব হিন্দু-সভ্যতার এই 'স্টিলফ্রেম'।

বলা বাহুল্য এ 'স্টিলফ্রেমে'র শলাকা চোখে দেখা যায় না। চুম্বকের 'লাইনস অব ফোর্সেস' শক্তিসঞ্চার পথের মতো সেগুলি অদৃশ্য। তাদের উপাদান কোনও বস্তুসমষ্টি নয়, এমনকী রাষ্টিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানও নয়। চিন্তা বা মননের কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গি, ভাব ও অনুভূতির কয়েকটি বিশেষ্যমুখী প্রবণতা দিয়ে এ 'ফ্রেম' তৈরি। সুতরাং আর্যমনোভাব জিনিসটিকে রূপরেখায় চোখের সুমুখে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার সৃষ্টিগুলির সঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রত্যক্ষ পরিচয় হলে এ মনোভাবের যে সুস্পষ্ট ছবি মনে একে যায়, ভাষায় তার মূর্তি গড়া সুদক্ষ শিল্পীর কাজ। সে অনধিকার চেষ্টায় উদ্বাহু না হয়ে সাদা কথায় তার দু'-একটা লক্ষণের কিছু আলোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা মাত্র করব। ইংরেজিতে যাকে 'সেন্টিমেন্টালিজম' বলে, আমরা তার বাংলা নাম দিয়েছি ভাবালুতা। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি সমাজে বিগত শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছর ছিল এই ভাবালুতার পুরো জোয়ারের সময়। উনবিংশ শতাব্দীর যে ইংরেজি কাব্য ও সাহিত্যে তখন শিক্ষিত বাঙালির মন পুষ্ট হচ্ছিল, সে কাব্য সাহিত্য 'সেন্টিমেন্টালিজম'-এর রসে ভরা; সুতরাং তার প্রেরণায় বাঙালি যে সাহিত্য সৃষ্টি করছিল, তা ভাবালুতায় ভরপুর। এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মাত্র যে অংশের তখন শিক্ষিত বাঙালির উপর প্রভাব ছিল, সেই বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যও এই ভাবালুতার অনুকূল। এই মানসিক আবেষ্টনের মধ্যে বর্ধিত হয়ে প্রাচীন আর্যমনোভাবের যে লক্ষণ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের চোখ ও মন সবচেয়ে সহজে ও সবলে আকর্ষণ করেছে, সে হচ্ছে 'সেন্টিমেন্টালিজম' বা ভাবালুতার অভাব; এবং কেবল অভাব নয়, বিরোধী ভাবের আধিপত্য। কারণ প্রাচীন হিন্দুর মনোভাবের এমন একটা ঋজু কাঠিন্য ছিল, যা কি শরীর

কি মনের সমস্ত রকম নুইয়ে-পড়া ও লতিয়ে-চলার বিরুদ্ধ। কালিদাস আর্যরাজার মৃগয়াকর্ষিত শরীরের যে ছবি এঁকেছেন, সেটা প্রাচীন আর্যমনেরও ছবি।

‘অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদ্দলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি।’

‘মোদহীন কৃশতা ঋজু দীর্ঘতায় কৃশ বলে লক্ষ্য হয় না। পর্বতচারী গজের মতো দেহ যেন কেবল প্রাণের উপাদানেই গড়া।’ অথচ এই মেদশূন্য কৃশতা কল্পনা-অকুশল মনের বস্তৃতান্ত্রিক রিক্ততা নয়। হিন্দুর বিরাট পুরাণ ও কথাসাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈন গাথার বিপুলতা ভারতীয় আর্যমানের অফুরন্ত কল্পনালীলার পরিচয় দিচ্ছে। এ কাঠিন্যও শুষ্কপেশি কঙ্কালসার কাঠিন্য নয়। ভাবের দীনতা, রসবোধ ও রসসৃষ্টির অক্ষমতা জাতির মনকে বিধিনিষেধ-সর্বস্ব যে শুষ্ক কঠিনতা দেয়, সে কাঠিন্য হিন্দুর কখনও ছিল না। বেদসূক্তের উষার বন্দনা থেকে ভর্তৃহরির শতক ত্রয় পর্যন্ত ভাব ও রসের সহস্র ধারা তাকে পাকে পাকে ঘিরেছে। তার ভৌগকে শোভন ও জীবনযাত্রাকে মণ্ডনের জন্য চৌষট্টি কলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমস্ত ভাব ও কল্পনা, রস ও কলাবিলাসের মধ্যে একটা সরল, কঠিন মেরুদণ্ড সব সময়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। প্রাচীন আর্যমনে ভাবের অভাব ছিল না। কিন্তু আমরা যাকে বলি ‘ভাবে গলে যাওয়া’, তার মাধুর্য সে মনের রসনা আস্বাদ করেনি। ভগবান বুদ্ধ লোকের জন্মজরামরণের দুঃখে স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, সম্পদ ছেড়েছিলেন, কিন্তু চোখের জল ছাড়েননি।

পণ্ডিত লোকে এমনও বলেছেন যে, প্রাচীন আর্যজাতি মূলে ছিল যাযাবর লুঠতরাজের দল-’প্রিডেটারি নোমাডস’। অন্য ধ্রুবশীল সভ্যজাতির ঘাড়ে চেপে তাদের পরিশ্রমের অন্ন খেতে খেতে তাদেরই সংস্পর্শে তাঁরা ক্রমে সভ্য

হয়েছে। এই ধার-করা সভ্যতার বীজ উর্বরা জমিতে খুবই ফলেছে বটে, কিন্তু তার শিকড় আদিম যাযাবরত্বের প্রস্তরকঠিন অন্তর ভেঙে মাটি করতে পারেনি, ফুলপাতায় ঢেকে রেখেছে মাত্র। এ মতের ঐতিহাসিক মূল্য যতটা থাক না থাক, এটি স্পষ্টই প্রাচীন আর্যমনোভাবের একটা পৌরাণিক অর্থাৎ ইভলিউশনারি' ব্যাখ্যা। একটি ছোট উদাহরণ দিই। নাটক ও নাট্যাভিনয় প্রাচীন হিন্দুর প্রিয়বস্তু ছিল। হিন্দু আলংকারিকেরা কাব্যের মধ্যে নাটককেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। তাদের শিল্পকলার সংখ্যাও গণনায় চৌষট্টি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কিন্তু হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র একযোগে বিধান দিয়েছে– কারুকর্ম ও কুশীলবের কর্ম শূদ্রের কাজ, আর্যের নয়।'(২) উদাহরণে পুথি বেড়ে যায়। কিন্তু আর্যমনের এই কাঠিন্য যে কত কঠোর, তা তাঁরা নিজেদের জীবনে অপরাহ্নকালের জন্য যে দুটি আশ্রমের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার কথা একটু কল্পনা করলেই উপলব্ধি হয়।

'গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপালিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ।।' (মনুঃ, ৬/২)

'গৃহস্থ যখন দেখবে গায়ের চামড়া শিথিল হয়ে আসছে, চুলে পাক ধরেছে, ও পুত্রের পুত্র জন্মেছে, অর্থাৎ বার্ধক্যের অপটু শরীরে গৃহের ছোটখাটো সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পুত্র পৌত্রের সেবা ও শ্রদ্ধা সবচেয়ে কাম্য হয়ে এসেছে, তখন ঘর ছেড়ে বনে প্রস্থান করবে।' হতে পারে সে বন খুব বন্য ছিল না। কিন্তু পুরাতন প্রিয় গৃহ ও সমাজের সঙ্গে সমস্তরকম সম্বন্ধচ্ছেদের নির্মমতাতেই তা ভীষণ।

'ন ফালকৃষ্টমশ্রীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ।
ন গ্রামজাতন্যার্ত্তোহপি মুলানি চ ফলানি চ ।।' (মনুঃ, ৬/১৬)

‘ভূমিকর্ষণে যা জন্মেছে, পড়ে পেলেও তা আহার করবে না। আর্ত হলেও গ্রামজাত ফলমূল গ্রহণ করবে না।’ এই বনবাসে উগ্র তপস্যায় নিজের দেহ শোষণ করাই ছিল বিধি।

‘তপশ্চরংশ্চোগ্রতরাং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ।।’ (মনুঃ, ৬/২৪)

কিন্তু মৃত্যুকে অভিনন্দন করে এ জীবনেরও সংক্ষেপ কামনা করা নিষিদ্ধ ছিল।

‘নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা ।।’ (মনুঃ, ৬/৪৫)

‘মরণকেও কামনা করবে না, জীবনকেও কামনা করবে না। ভৃত্য যেমন ভৃতিপরিশোধের অপেক্ষা করে, তেমনি কালের অপেক্ষা করবে।’

বানপ্রস্থের উপর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কতটা অনুরাগ আছে জানিনে, কিন্তু মনের যে বীর্য নিজের বার্ধক্যদশার জন্য এই বানপ্রস্থের বিধান করেছিল, সেই বীর্য তার মনকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আধুনিক হিন্দুর মনে প্রাচীন আর্যমনের এই বীর্য ফিরিয়ে আনতে চান। এবং বর্তমানের মধ্যে অতীতকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা যদি reactionary হয়, তবে চৌধুরী মহাশয়কেও reactionary বলতে হবে।

হিন্দুমনের কাঠিন্য ও বীর্য কালবশে কমে আসছিল, এবং মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে কমার বেগ ক্রমে দ্রুত হয়ে এখন প্রায় লোপের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মনের একটা কোমলতা, গুটিকয়েক রসে আবিষ্টতা ও ভাবে বিহ্বলতা, তার খালি জায়গা অনেকটা জুড়ে বসেছে। হিন্দুর সচল মন নিশ্চেষ্ট

থাকেনি। এই নতুন মনোভাবের উপযোগী ধর্মসাপনা, কাব্য ও দর্শন গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে এর সাধক শ্রীচৈতন্য, কবি চণ্ডীদাস, দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী। প্রমথবাবু যদি সবুজপত্রে' প্রাচীন হিন্দুয়ানি প্রচারও করতে চান, তবে এই নবীন হিন্দুয়ানির সঙ্গে তাঁকে লড়তে হবে। কারণ 'পুরুষ ব্যাঘ বনাম মানুষ মেষ'-এর মামলায় তিনি যে বেদখল বাদীর পক্ষে সরাসরি একতরফা ডিক্রি পাবেন, এমন মনে হয় না। প্রথম তো তামাদি দোষ কাটাতে বেগ পেতে হবে। তারপর সভ্যতার ইতিহাসে বাঘের চেয়ে মেষ হয়তো সভ্যতার জীব। এবং 'দাসমনোভাবের চেয়ে যে, 'প্রভুমনোভাব' শ্রেষ্ঠ, তাও বিচার সাপেক্ষ। যাহোক, এ-তর্ক যদি প্রমথবাবু সত্য সত্যই তুলতে পারেন, তবে বাংলাসাহিত্যে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের একটা নতুন সংস্করণ অভিনয় হবে। কারণ অসম্ভব নয় যে, বাংলার তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে প্রাচীন হিন্দুর কতকটা কাঠিন্য ও বীর্য বিকট ছদ্মবেশে লুকানো আছে।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবত্বই প্রমথবাবুর একমাত্র প্রতিমাল্ল হবে না। বাঙালির ইংরাজি-শিক্ষিত মন আজকার দিনে অনেক রকম সমন্বয়' সাধন করেছে। বৈষ্ণব আচার্যেরা যে রসতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, সে রস ইক্ষুরস। সাংসারিক ভোগসুখ, গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সমস্ত পিষে ফেলে তবে সে রস নিঙড়ে নিতে হয়। কিন্তু আমাদের ইংরেজি শিক্ষায় 'একলেকটিক' মন ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের সঙ্গেও রসাতত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছে। অফিস, আদালত, শেয়ার মার্কেট, খবরের কাগজ, এ সব বাহাল রেখেই আমরা ও-রস ভোগ করছি। অর্থাৎ ও-রস এখন আর ইক্ষুদণ্ডে বন্ধ নেই, পেটেন্ট করে বোতলে পোরা হয়েছে। দিনের কাজের শেষে, কি ছুটির দিনে, খুব সুখে ও সহজে ওকে ঢেলে সম্ভোগ করা চলে। প্রাচীন হিন্দুর পক্ষ নিলে এ সমন্বয়ের সঙ্গে প্রমথবাবুকে যুদ্ধ করতে হবে। এবং ধর্মশাস্ত্রকারেরা বর্ণসংকরের বিরুদ্ধ হলেও আধুনিক বিজ্ঞান নাকি তার সপক্ষ। সুতরাং এ যুদ্ধ জেতাও সহজ হবে না। মোট কথা

প্রাচীন হিন্দুয়ানির যুদ্ধে লড়তে হলে, প্রাচীন হিন্দুমনের কাঠিন্য ও বীর্যের প্রয়োজন হবে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর মনে ও-গুণ আছে বলেই জানি। সুতরাং তিনি এতে সাহসী হলেও হতে পারেন।

ভাদ্র ১৩৩২

---

(১) বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্তস্পত্যাঃ, সংবরণ মাত্রং হি ঐয়ী লোকযাত্রাবিদ ইতি।' (কৌটিল্য, ১/২)
(২) শূদ্রস্য দ্বিজাতি শুশ্রষা বার্ত্তী কারুকুশীলবকর্ম্ম চ'-(কৌটিল্য, ১/৩)

ভারতবর্ষ

হালের ভারতবর্ষ নিয়ে আমাদের ইংরেজ সরকারের যে মুশকিল হয়েছে তার বিশগুণ বিপদে পড়েছি আমরা ভারতবাসীরা প্রাচীন ভারতবর্ষকে নিয়ে।

বর্তমান যাহোক অনেকটা চোখের সামনে রয়েছে। ওর ভিতরে কি আছে না আছে আশঙ্কা হলে সঙিন দিয়ে খুঁচিয়ে দেখা যায়; ওর ধড়ফড়ানি লাঠি পিঠে ঠান্ড করা চলে; ওর মুখরতার মুখ বন্ধের জন্য মাোয়া লাড্ডু, রাহা খরচ আছে। কিন্তু অতীতকে নিয়ে কী করা যায়। ওকে না যায় চোখে দেখা, না চলে চেপে ধরা। অথচ অবস্থার গতিকে এমনি দাঁড়িয়েছে যে, আজকার দিনে ভারতবর্ষের অতীত ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফিরাতে গেলেই গালে চড় পড়ে; ওর বোঝার চাপে পিঠ বঁকা হওয়ার নামই মুক্তি নয়। এ বলার জোট নেই। কারণ আমরা দশে মিলে ভোটে প্রায় ঠিক করে ফেলেছি যে ভারতবর্ষের অতীতই তার বর্তমানের পথের আলো; ও-আলো আমাদের পেছন থেকে

সামনে ছায়া না ফেলে কেবল আলোই ছড়াচ্ছে। আর এতেও আমাদের সন্দেহ নেই যে ওই অতীতকে পিঠে সোয়ার করতে পারলেই সে আমাদের সোজা গম্য অর্থাৎ কাম্য স্থানে পৌছে দেবে। জাতি যখন তার বর্তমানের হীনতা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, পঙ্গুতা পরিহার করে এগিয়ে চলার বল সংগ্রহ করে, তখন নিজের অতীত থেকে শক্তি লাভের চেষ্টা কিছু নূতন নয়। সামনে এগিয়ে চলাকে পিছনে ফিরে যাওয়া বলে কল্পনার মধ্যেও নূতনত্ব কিছু নেই। এ-সব ঘটনা মানুষের ইতিহাসে নানা জাতির মধ্যে বার বার ঘটেছে। এর কারণ কোনও সভ্যতার গতিই একটানা নয়। দৌড়ে বসে জেগে ঘুমিয়ে, উঠে পড়ে এমনি করেই সভ্যতা চলছেও চলবে। সেই জন্য কোনও আপাত-স্থবির জাতির মধ্যে যখন নব-জীবনের স্পন্দন আসে এক অর্থে সেটা তার পুনর্জন্ম। তার অতীতের যে-সব অংশে প্রাণের প্রাচুর্য ছিল তার সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। নবজাগ্রত জাতির চোখের সম্মুখে প্রাণে ভরপুর ভবিষ্যতের যে ছবি থাকে প্রাণহীন বর্তমানের চেয়ে প্রাণবন্ত অতীতের সঙ্গে তার মিল ঢের বেশি। এই জন্য ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে মনে হয়। অতীতের দিকে ফিরে চলা। কিন্তু মুখে যাই বলুক, জাতির অন্তরাত্মা যা’ চায় তা’ অতীতকে মকসো করতে নয়, নিজের প্রাণে অতীতের প্রাণের সেই স্পর্শ পেতে যার বেগে অতীত তার বর্তমানকে ছাড়িয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

আজকে আমরা ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যা পূরণে যে তার অতীতকে ডাক দিচ্ছি, তারও নিশ্চয় এই অর্থ। আমরা ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের সেই সব যুগের সঙ্গে মনের যোগ ঘটাতে চাচ্ছি। যার প্রাণের বেগ ও গতি আমাদের বর্তমান চেষ্টা ও ভবিষ্যৎ আদর্শের অনুকূল ও অনুরূপ। না হলে কোনও জাতিরই সমস্ত অতীতটা তার গৌরবের নয়; ভারতবর্ষেরও নয়। সুতরাং এ প্রশ্নটা উঠে পড়ে, আমাদের এই বাঞ্ছিত অতীত ভারতবর্ষের বিচিত্র ও দীর্ঘ ইতিহাসের কোন অতীত? ভারতবর্ষের প্রাণ মনের বিকাশের কোন ছবিটা বর্তমানে আমাদের চোখের সামনে রাখা সবচেয়ে দরকারি। সকলেই

জানে এর এক কথায় উত্তর আধ্যাত্মিকতা’। আর এ উত্তরের সুবিধা এই যে সংক্ষিপ্ত হলেও ওর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ উত্তর যাঁরা দেন তাঁরা বলেন ও বস্তু অনুভূতিগম্য, কথায় বোঝানোর জিনিস নয়। ওর স্বরূপ অবাচ্য; কেবল ও কী নয়। তাই কতকটা নেতি নেতি করে বলা যায়। এবং তা বলতে গেলে যা দাড়ায় সে হচ্ছে ও পদার্থ সমাজতত্ব নয়, রাজনীতি নয়, অর্থনীতি নয়; ধর্ম-ব্যবহার, শিল্পকলা নয়; কাব্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন-কিছু নয়। অর্থাৎ মানুষের প্রাচীন ও নবীন আর সমস্ত সভ্যতা যা গৌরবের জিনিস বলে জানে তার সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নেই। আর ওই বস্তু হল ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার বিশিষ্টতা, যাকে ফিরিয়ে আনতে পারলেই আমাদের সমস্ত দুঃখ-দীনতার অবসান হবে। সোজা কথায় ভাালা তবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ছিল একটা সৃষ্টিছাড়া জিনিস, যার সঙ্গে বাকি পৃথিবীর কোনও যোগ ছিল না। বর্তমানে আমাদের হতে হবে কিন্তুতকিমাকার জাতি, যার সঙ্গে আর কারওর কোনও মিল থাকবে না।

মন বোজার হলেও সত্যের খাতিরে স্বীকার কবতে হবে, প্রাচীন ভারতবর্ষের এই আধ্যাত্মিক সভ্যতার ছবি আমরা আঁকিনি। একেছে একদল ইউরোপীয় পণ্ডিত, যাদের বলে ‘ওরিয়েন্টালিস্ট’–প্রাচ্যতত্ববিদ। এদেরই ক’জন মিলে এই উপন্যাসটি রচনা করেছে যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা একটা অদ্ভুত জিনিস ছিল। অন্য সব সভ্যতার সঙ্গে তার মিলের চেয়ে গরমিল বেশি। আর আর সভ্যতা বাস করে ইহলোকে, ও-সভ্যতা বাস করে পরলোকে; আর সবাই চায় জীবন, ও চাইত মৃত্যু; আর সবার চোখ ছিল চেয়ে দেখবার জন্য, ওর ছিল বুজে ধ্যান করবার জন্য? এই উপন্যাসটি মুখস্থ করেই আমরা জোর গলায় প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার বক্তৃতা উদগিরণ করছি। এর এক প্রধান কারণ আমাদের বর্তমান প্রভুদের উপর অভিমান। তাঁরা নাকি আমাদের বুটের তলায় চেপে রেখেছেন, তাই আমরা সেখান থেকেই বলছি, ‘আছি বটে

নীচে পড়ে। কিন্তু তোমরা বুঝবে না। আমাদের বাস কত উচুতে। তোমরা যা’ সবের গৌরব কর ও-সব তো কিছুই নয়। আমাদের প্রাচীন পিতামহেরা ও-সবকে সভ্যতার উপকরণ বলেই গণনা করতেন না। তাঁরা ছিলেন আধ্যাত্মিক; আমরাও তাদেরই বংশধর।’ নইলে এ-সব কথা বোঝা শক্ত যে, যে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস হল মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র ছিল মনুসংহিতা, যার অর্থশাস্ত্রের আচার্য কৌটিল্য, যার মোক্ষশাস্ত্র ছিল গৃহীর অপাঠ্য, আর বাৎস্যায়নও যার ঋষি, তার ছবি আমরা আধ্যাত্মিকতার একরঙা তুলিতে কেমন করে এঁকে তুলি। তবে এ কথাও ঠিক, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার বক্তৃতা দিতে তার যা সব নিদর্শন আছে তার সঙ্গে পরিচয়ের কোনও প্রয়োজন নেই; মনের খুশিতে কল্পনা করে নিলেই হল। আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছিলেন, বাল্মীকির রামায়ণের উপর তার অগাধ ভক্তি তিনি সব সময়ে প্রচার করতেন। কথাপ্রসঙ্গে সন্দেহ হল ও-বই তিনি কখনও চোখে দেখেননি। জিজ্ঞাসায় বললেন, বাল্মীকির রামায়ণ মুলে কি অনুবাদে তিনি কখনও পড়েননি। বটে। কিন্তু তুলসীদাসের রামায়ণের ইংরাজি অনুবাদ অনেকটা পড়েছেন। একদিন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড থেকে বর্ষায় রামের বিরহ বর্ণনা তাকে পড়ে শোনালে দেখলেম তিনি বড় মনঃক্ষুন্ন হলেন। তার বিশ্বাস ছিল স্ত্রীর জন্য ও-রকম বিলাপ একালের কলেজের ছেলেদের ফ্যাশান; কিন্তু রামচন্দ্রের পক্ষে— স্পষ্ট বুঝলুম রামায়ণের রামসীতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর মনে কল্পনার যে-ছবি ছিল রামায়ণ বইটা তাতে একটা জবর ঘা দিল।

কিন্তু আজ যখন আমরা কল্পনার জাল বোনা ছেড়ে জীবনের জাল নিয়ে বসেছি তখন এ কথা জোর করে স্পষ্ট করে বলার সময় হয়েছে, কি ভারতবর্ষের অতীত, কি তার বর্তমান কিছুই পৃথিবী-ছাড়া সৃষ্টিছাড়া নয়। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিশিষ্টতা অবশ্যই ছিল, কারণ দুটো সভ্যতা দূরে থাকুক, এক গাছের দুটো পাতাও ঠিক একরকম নয়। ঠিক একই ছাঁচের বহু

জিনিস বের হয়। কল থেকে, জীবন থেকে নয়; কিন্তু এই বিশিষ্টতার যা ভিত্তি তা মানব-সভ্যতার সাধারণ ভিত্তি। ইমারতের গড়ন আলাদা কিন্তু তার মালমশলা একই। প্রাচীন পৃথিবীর যেগুলি শ্রেষ্ঠ সভ্যতা, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে তাদের বৈষম্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশি। যেমন মানুষে মানুষে তফাতের চেয়ে মিলই বেশি। ইংরেজ টেবিল পেতে কাঁটা চামচে দিয়ে খায়, আমরা পাতা পেতে হাত দিয়ে খাই। এর মধ্যে তফাতের চেয়ে এই মিলই নিশ্চয়ই ঢের বেশি যে, শরীর ধারণের জন্য ইংরেজকেও খেতে হয়, ভারতবাসীকেও খেতে হয়। আজকার চিত্তবিভ্রমের দিনে এই সহজ কথা আমাদের মনে করা দরকার হয়েছে যে প্রাচীন ভারতবর্ষেও রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত, সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করত, দুর্ভিক্ষে লোক মরত, কবিরা প্রেমের কবিতা লিখত, উৎসবে মোহমুদ্গর পাঠ হত না। এবং আমরা বর্তমান ভারতবর্ষে যে সভ্যতা গড়ে তুলব। তারও বিশিষ্টতা থাকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু চারপাশের সভ্যতার সঙ্গে সে একটা খাপছাড়া কিছু হবে না। তারও রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবহার দরকার হবে। সে-ও হবে মানুষের সভ্যতার বিচিত্র লীলার একটা প্রকাশ। এ নাস্তিকতা মন থেকে দূর করতে হবে, যে, ভগবান সমস্ত পৃথিবীকে বঞ্চিত করে শ্রেষ্ঠ যা কিছু তা ভারতবর্ষের উপরেই বর্ষণ করবেন।

এখন মনে হচ্ছে, এই যে তর্ক করছি এও বিশিষ্টতার দাবি শুনে শুনে একটু বিভ্রান্ত হয়ে। ভাবটা প্রকাশ করছি যেন এ দাবির মধ্যে একটা বিশিষ্টতার কিছু আছে। কিন্তু ভেবে দেখছি ওই বিশিষ্টতার দাবি সব সভ্যজাতিই করেছে। ‘আমরা আর কারু মতো নাই’ এ কথায় সবাই আর সবার মতো; বিশেষ করে যে-সব জাতি ঘা খেয়ে পড়ে আবার উঠতে যাচ্ছে। নেপোলিয়নের মার খেয়ে প্রশিয়া যখন শক্তিসঞ্চায়ের চেষ্টা করছিল, তখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের কাছে দার্শনিক ফিক্তে ঠিক এই বক্তৃতাই দিয়েছিলেন। ‘আমরা জার্মান জাতি বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি। মানুষের ভবিষ্যৎ

আমাদের উপরেই নির্ভর করছে। আমরা যে সভ্যতা গড়ব সে ‘ন ভূতো ন ভবিষ্যতি’।’

এতক্ষণ যা বললুম তা এই কল্পনা করে যে বর্তমান ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর ভারতবর্ষ। অতীত থেকে যা কিছু আলো চাই সে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার আলো। কিন্তু সবাই জানি এটা কেবলই কল্পনা। বর্তমান ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর ভারতবর্ষ নয়। অন্ততপক্ষে হিন্দু মুসলমান এ দুয়ের ভারতবর্ষ। এবং যে অতীত হিন্দুর গৌরবের তাতে মুসলমানের স্পর্শ নেই। আর যে অতীত মুসলমানের গৌরবের তা ভারতবর্ষের অতীত নয়। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের গড়ে তুলতে হবে ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সন্দেহ মাত্র নেই, এই ব্যাপারে আমরা যেই খেলা ছেড়ে কাজে লাগিব আমনি বর্তমানের ঘষায় প্রাচীন গৌরবের খোঁচাগুলি পালিশ হয়ে যাবে। হিন্দুর যাবে, মুসলমানেরও যাবে। এবং বিধাতার কৃপায় আমাদের হয়তো সেই ভূমিতেই যেয়ে দাঁড়াতে হবে যেখানে মানুষের বিভিন্ন সভ্যতা গোঁড়ামি ছেড়ে নির্বিরোধে মিশতে পারে।

তুতান্-খামেন্

হাজার তিনেক বছর হল মিশরের এই রাজ্যটি জীবনযাত্রার চেয়ে বেশি আড়ম্বরে মরণ-যাত্রা করেছিলেন। খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, গন্ধ-অলংকার–সেগুলি ভরে নেবার নানারকম শৌখিন বাক্স-পেটরা, খাট-পালঙ্ক, চৌকি-সিংহাসন, যান-বাহন, এমনকী বৈতরণীর খেয়া পারের নীেকে পর্যন্ত সঙ্গে ছিল। তিন ঘর বোঝাই এইসব আসবাবপত্র এপার থেকে ওপারের পথ কতটা সুগম করেছিল জানার জো নেই, কিন্তু ওগুলো যে মহারাজকে ওপার

থেকে এপারে তিন হাজার বছরের ব্যবধান নিমেষে পার করে এনেছে তাতে সন্দেহ নেই। মহারাজকে তো এ season-এ ইউরোপের leader of fashion বললেই চলে। তার পোশাকের cut-এ লন্ডনে জামা কাটা হচ্ছে, তার কোমরবন্ধের কায়দায় প্যারিতে মেয়েদের কোমরবন্ধ তৈরি হচ্ছে। আশা করা যায়, কলকাতার রাস্তায়ও 'তুতানখামেন। চটিজুতার বিজ্ঞাপন শীঘ্রই দেখা যাবে।

মিশরের সভ্যতার প্রকাণ্ড দীর্ঘ ইতিহাসে তুতান-খামেন খুব প্রাচীন রাজা নন। ঐতিহাসিক জ্ঞান বর্তমানে যে রাজবংশে গিয়ে ঠেকেছে বলে তাকে বলা হয় প্রথম রাজবংশ, মিশরের সেই রাজবংশের রাজারা এখন থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগেকার লোকঅর্থাৎ তাদের সময় থেকে তুতান-খামেনের সময়ের ব্যবধান, তুতান-খামেনের ও বর্তমান কালের মধ্যের ব্যবধানের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। আর তুতান-খামেনের কবরে জিনিসপত্র, ছবি, মূর্তি যা-সব পাওয়া গেছে, বিস্ময়ের প্রথম চমক কেটে গেলে হয়তো প্রমাণ হবে, ওদের সোনার পালিশ আর মণি-মাণিক্যের দুযতি ইতিহাসের অন্ধকারকে বড় বেশি আলো করেনি–মিশরের প্রাচীন সভ্যতার ওরকম সব নিদর্শন বেশির ভাগই ইতিপূর্বেই আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু এ-সব নাস্তিকতার কথা আজ নয়। আজ জয় মহারাজ তুতান-খামেনের জয়'। দুয়েটারের বিদ্যুৎ সবাইকে ধাক্কা দিয়ে জানাচ্ছে, মানুষের সভ্যতা কিছু সেদিনকার বস্তু নয়; ও-জিনিসটি প্রাচীন ও বুনিয়াদি। চেয়ে দেখ তিন হাজার বৎসর আগেকার মিশরের ঐশ্বর্য, শিল্প-কলা, বিলাস, ব্যসন। যা নিতান্ত আধুনিক হালফ্যাশান ভেবেছিলে তাও গ্রিস জন্মাবার হাজার বছর আগে মানুষের সমাজে চলতি ছিল।

কিন্তু কেবল কথায় খুশি না থেকে কাগজওয়ালাদের ছবি ছাপতে বললে কে? তাদের ছবিতে কি সোনার রং ওঠে, না মণি-জহিরতের জ্যোতি ফোটে? ও-ছবিতে তো দেখছি তুতানখামেনের পেটা-সোনার সিংহাসন আর তাঁর আবলুশ কাঠের বেড়াবার ছড়ি দুয়ের একই কালো কালির রং। তার সোনার লতা-কাটা গজদন্তের আসনকে আমার সেগুন কাঠের চেয়ারখানার জ্ঞাতি-ভাই বলেই মনে হচ্ছে। যাহোক এ-সব আসবাবপত্রের ছবি তবুও ছিল একরকম। কালির কালো আঁচড়কে শিল্পীর সোনালি রেখা কল্পনা করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু তুতানখামেনের কবরে পাওয়া ছবি ও ভাস্কর্যের ফটোগুলো নির্বিচারে কেন ছাপানো? ওই মহারাজ তুতান-খামেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিজয়ী বীরের দৃপ্ত ভঙ্গিতে। বেশ, দেখে মন খুশি হল। কিন্তু ওই ওরা আবার কারা? ওই যাদের ঘাড়ের বোঝার ভারে কোমর নুইয়ে পড়েছে। প্রাচীন মিশরের ঐশ্বর্যে ওদের অংশটা কী সে খবর তো রয়টার দেয়নি। দেশ-বিদেশের দ্রব্যসম্ভার ওরা রাজপ্রাসাদে বয়ে নিয়ে আসছে? বাঃ, তবে তো দেখছি মানুষের সভ্যতার সবটাই সুপ্রাচীন। তুতানখামেনের রাজ-ঐশ্বর্যও প্রাচীন, আজকের রাজপথের কুলি-মুটেও সমান প্রাচীন। যাঁরা তুতানখামেনের দিনে ঘাড়ে বোঝা বইত, আর যাঁরা আজকের দিনে মাথায় মোট বয় তাদের মধ্যে তো কোনও তফাত নেই। সেই কটিতে কৌপীন, শরীরে ক্লান্তি, মনে দীনতা— সবই এক। মানুষের সভ্যতা দেখছি উদভ্রান্ত প্রেমের' শ্মশানের মতো, ঈশা বল, মুশা বল, রামমোহন রায় বল, এমন সাম্য-সংস্থাপক জগতে আর নাই।' যেখানে ওর প্রকাশ সেখানেই ওই এক মূর্তি। বহু মানুষের নৈপুণ্যের সৃষ্টি, বহুলোকের পরিশ্রমের ফল ওই দু-একজন ভোগ করছে, অপব্যয় করছে, নষ্ট করছে, তুতানখামেনের মতো নিজের মরা শরীরের সঙ্গে মাটির নীচে কবর দিচ্ছে। তিন হাজার বছর আগেও যা, তিন হাজার বছর পরেও তাই। মানুষের সভ্যতার গোমুখী থেকে আজ পর্যন্ত ওই একই ধারা চলে এসেছে। কোনও ভগীরথের শঙ্খ ওকে নতুন খাদে বহাতে

পারবে, না। ওই খাদ দিয়ে চলেই ওকে মহাসাগরে বিলীন হতে হবে, তা মানুষেও জানে না, দেবতাও জানে না।

কান দিয়ে মন যে নেশা করেছিল তা চোখ দিয়ে ছুটে গেল–কাগজওয়ালাদের ছবির দোষে। তুতানখামেনের কবরের খবরে প্রাচীন মিশরের ঐশ্বর্য-বর্ণনা শুনে ভেবেছিলাম যাহোক, বাংলার বাইরেও একদিন একটা সোনার বাংলা ছিল; সেখানে সকলেরই গোলাভরা ধান, অর্থাৎ যব, গম, গোয়ালভরা গোরু, মুখভরা হাসি। কিন্তু তুতানখামেনের ছবির কালি দেখছি দুই সমুদ্র তিন নদী পার হয়ে সোনার বাংলার সোনাতেও এসে লাগল। বাংলা ছিল সোনার বাংলা’ তা তো বটেই। কিন্তু কবে ছিল? কল-কারখানা, ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় আসবার পূর্ব পর্যন্ত কি? সেই সময়েই তো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তাতে নাকি সোনার বাংলার এক পোয়া লোকের উপর না খেয়ে মরেছিল! মোগল পাঠানের আমলে বোধ হয়? বিদেশিদের বর্ণনা, আবুল ফজলের গেজেটিয়ার, মুকুন্দরামের কবিতা রয়েছে। গোলায় ধান, গোয়ালে গোরু অবশ্যই ছিল— এখনও আছে। কিন্তু এখনকার মতো তখনও সে গোলা আর গোয়ালের মালিক অল্প কজনই ছিল। সোনার বাংলার অনেক সোনার ছেলে তখন চটের কাপড় পরীত এমনও আভাস আছে। তবে হিন্দুযুগে নিশ্চয়। কিন্তু সে যুগেও কি এখনকার মতো দেশে শূদ্রই ছিল বেশি? তাদের Standard of living তো মনু বেঁধে দিয়েছেন–

‘উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণনি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধন্যানাং জীর্ণশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ ॥‘

ঋষি গৌতমেরও ওই ব্যবস্থা— ‘জীর্ণনুপানচ্ছত্রবাসঃ–কুচ্চাণুচ্ছিষ্টাশনং’। পুরনো জুতো, ভাঙা ছাতা, জীর্ণ কাপড় তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, ছেড়া মাদুর

তাদের আসন, উচ্ছিষ্ট অন্ন তাদের আহার। ‘পুলাক’ কথাটার অর্থ ধানের আগড়া; টাকাকারদের ভাষায় ‘অসার ধান’। দেশে গোলাভরা ধান থাকলেও দেশবাসীর বেশির ভাগের কপালে কেবল খুদকুঁড়ো জুটতে কোনও আটক নেই।

যাক, এসব ‘আনপেট্রিয়টিক’ খবর চাপা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু মহারাজ তুতান-খামেন একটা বিষয়ে বড় নিরাশ করেছেন। তাঁর নাড়ি-ভূড়ির চারপাশে বাক্স সিন্দুক যা সব সাজিয়েছিলেন তাতে যদি কেবল কাপড়-চোপড় টুকিটাকি বোঝাই না দিয়ে তাঁর ‘পেপিরাসের’ লাইব্রেরিটাও পুরে নিতেন তা হলে long journey-তে তারও bored হবার ভয় থাকত না, আমরাও চিরকৃতজ্ঞ থাকতাম। তুতানখামেনের দিনে মিশরের কবিরা নীল’ নদের জোয়ার-ভাটার যে গান গেয়েছিল, নদী-তীরের কুটিরবাসীদের সুখ, দুঃখ, প্রণয়, বিরোধের যে কাহিনি রচেছিল, সে-যুগের জ্ঞানীরা জীবন-মৃত্যুর রহস্য কোন চাবি দিয়ে খুলতে চেয়েছিলেন, তার পণ্ডিতদের চোখে পৃথিবীর চেহারা কেমনতর ছিল, মহারাজ যদি আমাদের এগুলি জানাবার ব্যবস্থা করতেন তবে তার তিন হাজার বছরের মরা যুগ আজকের দিনে সজীব হয়ে উঠত— তারের খবরে নয়, দরদি লোকের মনে। আমরা মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করতেম— সেই তিন হাজার বছর আগেকার মানুষ ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ। খবর এসেছে, সমাধির ঘরে গোটা কয়েক ‘পেপিরাস’-এর গোলাও পাওয়া গেছে। কিন্তু তাতে যে মহারাজের বীর্য ও বিজয়ের উপাখ্যান ছাড়া আর কিছু আছে এমন ভরসা নেই। সুতরাং মনের আপসোস মনেই থেকে যাবে।

এক বন্ধু খবর দিলেন, লুক্সরে যে কবর আবিষ্কার হয়েছে তা তুতানখামেন-ফ্যামেন। কারও নয়। মিশরতত্ত্বজ্ঞ ফরাসি পণ্ডিতরা নাকি বলেছেন ওটা

একটা ডাকাতের আডডা, ‘bandat’s den —রাজ-রাজড়াদের কবর লুটে, লুটের মাল ডাকাতরা একটা সুবিধামতো কবরে লুকিয়ে রেখেছে। এবং ওরকম সব ‘ডেন’ নাকি এর পূর্বেও আরও আবিষ্কার হয়েছে। ফরাসি পণ্ডিতদের এ-চালাকি চলছে না। আমরা সবাই বুঝেছি তাদের এ-সব কথা কেবল হিংসা ও ঈর্ষার কথা। ব্রিটিশ আর আমেরিকান মিলে এই আবিষ্কারটি করেছে, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজা ‘তোদন ক্ষম’ নাম ভাড়িয়ে হয়েছিলেন ‘তুতান-খামেন’ এটা প্রমাণ হয়-হয় হয়েছে, এই শুনেই তাঁরা এ-সব সন্দেহ রটাচ্ছেন। ইংরেজ-বাঙালি কো-অপারেট করে হয় কালীঘাটে, নয়। ডালহাউন্সি ইনস্টিটিউটে এখনই প্রতিবাদ সভা ডাকা উচিত।

বৈশাখ ১৩৩০

গণেশ

সর্ববিঘ্নহর ও সর্বসিদ্ধিদাতা বলে যে দেবতাটি হিন্দুর পূজাপার্বণে সর্বাগ্রে পূজা পান, তার ‘গণেশ’ নামেই পরিচয় যে তিনি ‘গণ’ অর্থাৎ জনসংঘের দেবতা। এ থেকে যেন কেউ অনুমান না করেন যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের যাঁরা মাথা, তাঁরা জনসংঘের উপর অশেষ ভক্তি ও প্রীতিমান ছিলেন। যেমন আর সব সমাজের মাথা, তেমনি তাঁরাও সংঘবদ্ধ জনশক্তিকে ভক্তি করতেন না, ভয় করতেন! ‘গণেশ’ দেবতাটির আদিম পরিকল্পনায় এর বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আদিতে ‘গণেশ’ ছিলেন কর্মসিদ্ধির দেবতা নয়, কর্মবিঘ্নের দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মতে এঁর দৃষ্টি পড়লে রাজার ছেলে রাজ্য পায় না, কুমারীর বিয়ে হয় না, বেদজ্ঞ আচার্যত্ব পান না, ছাত্রের বিদ্যা হয় না, বণিক ব্যবসায়ে

লাভ করতে পারে না, চাষির ক্ষেতে ফসল ফলে না। এই জন্যই 'গণেশে'র অনেক প্রাচীন পাথরের মূর্তিতে দেখা যায় যে, শিল্পী তাকে অতি ভয়ানক চেহারা দিয়ে গড়েছে; এবং গণেশের যে পূজা, তা ছিল এই ভয়ংকর দেবতাটিকে শান্ত রাখার জন্য; তিনি কাজকর্মের উপর দৃষ্টি না দেন, সেজন্য ঘুষের ব্যবস্থা। গণ-শক্তির উপর প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কর্তাদের মনোভব কী ছিল, তা গণেশের নর-শরীরের উপর জানোয়ারের মাথার কল্পনাতেই প্রকাশ।

কিন্তু এ-মনোভাব প্রাচীন হিন্দুর একচেটিয়া নয়। সকল সভ্যতা ও সমাজের কর্তারাই জনসংঘকে লম্বোদর গজানন' বলেই জেনেছেন। ওর হাত-পা মানুষের, কিন্তু ওর কঁধের উপর যে মাথাটি তা মানুষের নয়, মনুষ্যেতর জীবের। আর ওর উদর এত প্রকাণ্ড যে, তাকে যথার্থ ভরাতে হলে, যাদের কঁধের উপর মানুষের মাথা, তাদের সুখ-সুবিধার উপকরণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সব দেশের যাঁরা বুদ্ধিমান লোক, তারা, ওর মগজে মানুষের বুদ্ধির পরিবর্তে জানোয়ারের নির্বদ্ধিতা রয়েছে ভরসায়, ওর বিরাট উদরের যতটা খালি রেখে সারা যায়, সেই চেষ্টা করে এসেছে। সেইজন্য কখনও তাকে অঙ্কুশে ক্লিষ্ট, কখনও বা খোশামোদে তুষ্ট করতে হয়েছে। কারণ আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত কোনও 'পলিটিশ্যানের পলিটিক্যাল' খেলা এ-দেবতাটির সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়নি। অথচ সে সাহায্য পেতে হবে বিশেষ খরচের মধ্যে না গিয়ে। অর্থাৎ গণদেবতার পূজায় ভোগের উপকরণের দৈন্য সকলেই মন্ত্রের বহরে পূরণ করেছে— 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা', 'গণবাণীই ভগবদ্বাণী', 'সুরাজ থেকে স্বরাজ শ্রেষ্ঠ', 'জননায়ক হচ্ছে জনসেবক' ইত্যাদি। এবং সকলেই লম্বোদর গজেন্দ্রবদনের'' সৌন্দর্যবর্ণনায় শ্লোক রচনা করে তাকে তোষামোদে খুশি করেছে।

যাঁরা গণদেবতাকে খোশামোদে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাসিল করতে চায় না, চায় ওই দেবতাটির নিজের হিত— তাদের এ কথা মেনে নেওয়াই ভাল যে, এ দেবতার মানুষের শরীরের উপর গজমুণ্ডের কল্পনা একবারে মিথ্যা কল্পনা নয়। কোন শনির কুদৃষ্টিতে এর নরমুণ্ড খসেছে সে ঝগড়া আজ নিরর্থক। কোন দেবতার শুভদৃষ্টি এর মুণ্ডকে মানুষের মাথায় পরিণত করবে, সেইটি জানাই প্রয়োজন। কারণ খোশামুদেরা যাই বলুক, মানুষের কঁধে হাতির মাথা সুন্দর নয়, নিতান্ত অশোভন।।

যে-দেবতার সুদৃষ্টি এই অঘটন ঘটাতে পারে, তিনি হচ্ছেন বীণাপাণি, যিনি জ্ঞানের দেবতা। এক জ্ঞানের শক্তি ছাড়া গজমুণ্ডকে নরমুণ্ডে পরিবর্তনের ক্ষমতা আর কিছুরই নেই। সুতরাং গণদেবতার যাঁরা হিতকামী, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এই দেবতাটির মাথার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের তড়িৎ সঞ্চালন করা। জনসংঘকে সভ্যতার ভারবাহীমাত্র না রেখে, সভ্যতার ফলভোগী করতে হলে, প্রথম প্রয়োজন জনসাধারণকে জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। আকাশে বিস্তৃত বিশ্ব ও তার জটিল কার্যকারণজাল; কালে প্রসূত মানুষের বিচিত্র ইতিহাস, ও এই দেশ ও কালের মধ্যে বর্তমান মানুষের গতি ও পরিণতির জ্ঞান। আজকের দিনের পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের, এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ; ধন উৎপাদন ও বিতরণের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এমন অদ্ভূত জটিল ও বহুবিস্তৃত হয়ে উঠছে যে, অজ্ঞান জনসাধারণকে মাঝে মাঝে সংঘবদ্ধ করে বুদ্ধিমান লোকের নিজের হিত খুব সম্ভব হলেও, জনসাধারণের হিত একেবারেই সম্ভব নয়। বাইরের পরামর্শে গড়া ওইসব সাময়িক উত্তেজনার দল, সংঘের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের অন্তদৃষ্টির অভাবে ক্রমাগত ভেঙে যায়; আর যতদিন টিকে থাকে, ততদিনও ওই পরামর্শদাতাদের ক্রীড়ানক হয়েই থাকে।

জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে তার নিজের হিতের পথ নিজেকে চিনতে শেখানো কেবল বহুকষ্টসাধ্য ও অনেক সময়সাপেক্ষ নয়, ওই দীর্ঘ ঘোরানো পথ ছেড়ে, খাড়া সরল পথে তার হিতচেষ্টার প্রলোভন দমন করাও দুঃসাধ্য। এই নিরন্ন বঞ্চিত মানুষের দলকে সংঘবদ্ধ করে, কেবলমাত্র সংখ্যার জোরে তাদের ন্যায্য দাবি আদায় করিয়ে দিতে কোন জন-হিতৈষীর না লোভ হয়! কিন্তু, মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের গতির দিকে চেয়ে এ-লোভ দমন করতে হবে। অজ্ঞান মানুষের খুব বড় দলও চক্ষুষ্মান মানুষের ছোট দলের বিরুদ্ধে অনেক দিন দাঁড়াতে পারে না। এবং পৃথিবীর সব দেশে যে অল্প-সংখ্যক লোক জনসাধারণের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের বিরোধী মনে করে তাকে চেপে রেখেছে, তাঁরা আর যা-ই হোক, অতি কৌশলী ও বুদ্ধিমান লোক। এদের সঙ্গে লড়তে হলে, ভেবে না বুঝলে একদিন ঠেকে শিখতে হবে যে, সরল পথই সোজা পথ নয়।

কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার এইটিই একমাত্র, এমনকী প্রধান প্রয়োজন নয়। জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয়; জ্ঞানের চরম ফল যে তা চোখে আলো দেয়। জনসাধারণের চোখে জ্ঞানের সেই আলো আনতে হবে, যাতে সে মানুষের সভ্যতার যা-সব অমূল্য সৃষ্টি— তার জ্ঞানবিজ্ঞান, তার কাব্যকলা–তার মূল্য জানতে পারে। জনসাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল অন্ন থেকে বঞ্চিত বলে নয়, তার পরম দুর্ভাগ্য যে সভ্যতাব এইসব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত। জনসাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্নই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হলেও, কাজে তার স্থান জনসাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যে-সব দেশে আজ জনসংঘ মাথা তুলছে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝতে পেরে জনসাধারণ জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ সংখ্যার অনুপাতে জনসাধারণের সমাজে

শক্তিলাভের যা গুরুতর বাধা, অর্থাৎ সভ্যতালোপের আশঙ্কা, শিক্ষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সে বাধার ভিত্তি ক্রমশই দুর্বল হয়ে আসে। জনসাধারণের বিরুদ্ধে আভিজাত্যের স্বার্থের বাধা সভ্য-মানুষের মনের এই আশঙ্কার বলেই এত প্রবল। এই আশঙ্কার মধ্যে যা সত্য আছে তা যতটা দূর হবে, জনসাধারণের শক্তিলাভের পথের বাধাও ততটা ভেঙে পড়বে। উদর সর্বস্ব গজমুণ্ডধারী গণদেবের অভ্যুত্থান স্বার্থান্ধি মানুষ ছাড়া অন্য মানুষের কাছেও বিপৎপাত বলেই গণ্য হবে। গণদেবতা যেদিন নরদেহ নিয়ে আসবে, সেদিন তার বিজয়যাত্রার পথ কেউ রুখতে পারবে না।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৩